অধ্যায় ৮

মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ
Human Physiology : Coordination & Control

উত্তেজিত্ব বা **সংবেদনশীলতা** (sensitivity or irritability) জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বহিঃস্থ বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দেহের অন্তঃস্থ কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করার সামর্থও জীবের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি জীব তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে হুঁশিয়ার ও তৎপর। যে সকল পরিবর্তন শনাক্ত হয় এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্তযোগ্য হয় তাদেরকে **উদ্দীপনা** (stimuli; একবচন stimulus) বলে। উদ্দীপনা **রিসেপ্টর** (receptor) কর্তৃক গৃহিত হয়। এটি স্নায়ু বা **নিউরন** দ্বারা বাহিত হয় এবং **ইফেক্টর** (effector) কর্তৃক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)
- নিউরন
- সিন্যাপস
- মেনিনজেস
- নিউরোট্রান্সমিটার

আমরা যখন আহার করি তখন চোখ দিয়ে খাবারটি আগে দেখি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেই, হাত তুলে খাবারটি মুখে পুড়ি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেই, চোয়ালের পেশি দিয়ে খাদ্য চিবাই, গলাধঃকরণ, পেরিস্ট্যালসিসসহ লালাক্ষরণ থেকে শুরু করে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের এনজাইম ইত্যাদি ক্ষরিত হয়। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এমন কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারে না। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **সমন্বয়** (coordination) বলে। প্রাণিদেহে দুটি সমন্বয়কারী তন্ত্র রয়েছে। একটি **ভৌত সমন্বয়কারী তন্ত্র** যা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ঘটে। অন্যটি **রাসায়নিক সমন্বয়তন্ত্র** যা অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ অধ্যায়ে মানবদেহে সংঘটিত বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের গঠন এবং তাদের কর্ম কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা–১২ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● স্নায়বিক সমন্বয় ○ ধারণা ○ মস্তিষ্ক (গঠন, অংশ, কাজ) ○ করোটিক স্নায়ু (উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কাজ)
২. মস্তিষ্কের প্রধান ভাগের কাজ ব্যাখ্যা পারবে।	● মানব সংবেদী অঙ্গ ○ চোখ (গঠন ও কাজ) ○ কান (গঠন ও কাজ)
৩. বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক মিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● রাসায়নিক সমন্বয়
৪. সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে র সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে।	● অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ○ পিটুইটারি ○ থাইরয়েড ○ প্যারাথাইরয়েড ○ অ্যাড্রেনাল ○ গোনাড ○ অগ্ন্যাশয় (আইলেটস অব ল্যাঙ্গার হ্যান্স)
৫. রাসায়নিক সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
৬. মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
৭. দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পাবে।	● হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল

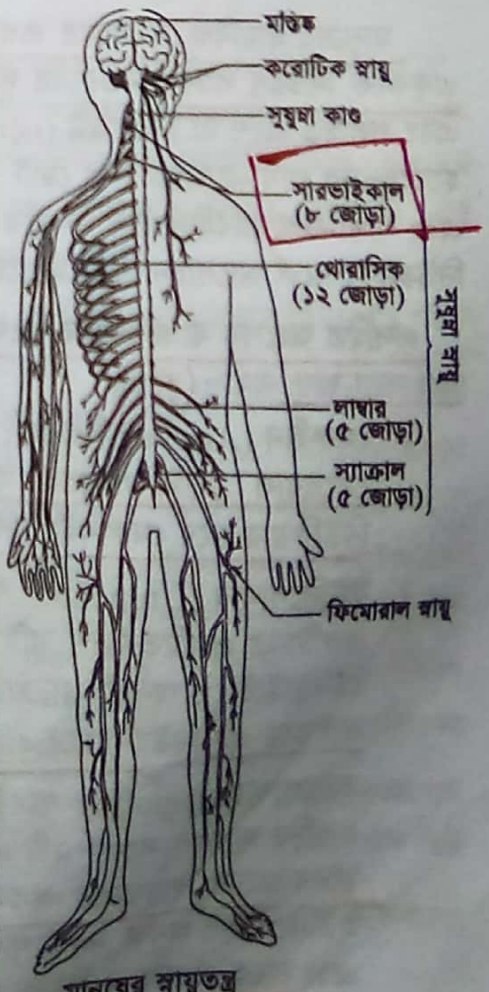

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়বিক সমন্বয় (Nervous Coordination)

উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার ক্ষমতা প্রতিটি জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের গতিপথে এককোষী জীব যখন এক সময় বহুকোষী জীবে পরিণত হয়েছে তখন দেহের সবখানে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অগণিত কোষের বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশে আবির্ভূত হয়েছে দ্রুত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী **স্নায়ুতন্ত্র**। স্নায়ুতন্ত্র এমন এক বিশেষ অঙ্গতন্ত্র যা দেহের অন্যসব অঙ্গতন্ত্রের কাজে অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের সাহায্যে দেহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহকে পরিচালিত করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে স্নায়ুতন্ত্র উৎপত্তি লাভ করে। (৫.)

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Nervous System)

১. পরিবেশের যে কোন প্রভাবককে উপলব্ধি করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। পরিবেশের সঙ্গে দেহের সমন্বয় রক্ষা এর প্রধান উদ্দেশ্য।

২. দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এগুলো সুনিয়ন্ত্রিত করা। যেমন– চলনকালে চলন অঙ্গসমূহের সঙ্গে মাথা, ঘাড়, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ একই সঙ্গে সমন্বিত হয়।

৩. ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশির নিয়ন্ত্রণ ও গ্রন্থির ক্ষরণের মতো চেষ্টীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাইরের উদ্দীপনাকে গ্রহণ করে।

৪. স্নায়ুকোষের উদ্দীপনাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিচালনা করে সংবেদী অঙ্গগুলোকে সক্রিয় করে।

৫. বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আচরণকে পরিবর্তিত করে।

স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে যে বিষয়গুলো জানা থাকা প্রয়োজন সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. নিউরন (Neurone)

মানুষের স্নায়বিক সমন্বয়ের প্রধান সমন্বয়কারী স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী এককে **নিউরন** বলে। নিউরনের দুটি প্রধান অংশ হচ্ছে **কোষদেহ** (cell body) এবং প্রলম্বিত অংশ বা **নিউরাইট** (neurite)। নিউরাইটকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে–বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ছোট ছোট প্রলম্বিত অংশ বা **ডেনড্রাইট** (dendrite) এবং শাখা-প্রশাখাবিহীন দীর্ঘ প্রলম্বিত অংশ বা **অ্যাক্সন** (axone)। পূর্বের শ্রেণিতে নিউরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

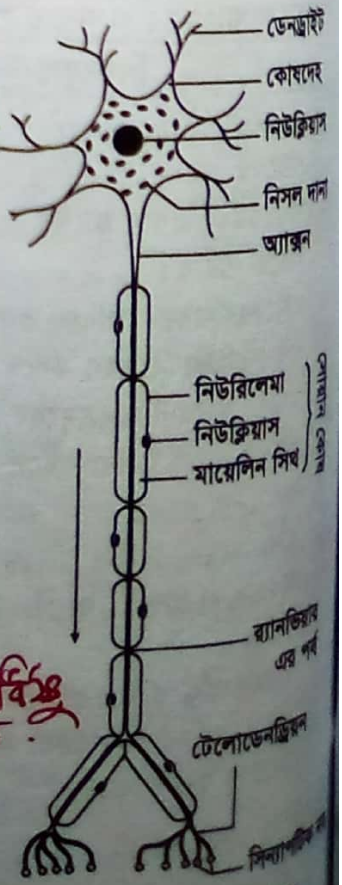

চিত্র ৮.১ : একটি নিউরন

প্রলম্বিত অংশের বা প্রবর্ধকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরনকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (৫.)

১. **মেরুহীন** (Apolar) **নিউরন** : কোষদেহে কোন প্রলম্বিত অংশ থাকে না। সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের বহিঃস্তরে এবং চোখের রেটিনার মধ্যবর্তী নিউক্লিয়ার স্তরে মেরুবিহীন নিউরন পাওয়া যায়। এস্ট্রোনাল গ্রন্থি

২. **ইউনিপোলার** (Unipolar) বা **একমেরুযুক্ত নিউরন** : কোষদেহ থেকে একটিমাত্র প্রলম্বিত অংশ সৃষ্টি হয় যা পরে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি ডেনড্রাইটে ও অন্যটি অ্যাক্সনে পরিণত হয়। মেরুদন্ডী প্রাণির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে এই নিউরন থাকে। এগুলো প্রধানত সেনসরি (সংবেদী)। মরুল বর্ধিষ্ণু নিউরন

৩. **বাইপোলার** (Bipolar) বা **দ্বিমেরুযুক্ত নিউরন** : কোষদেহ থেকে সৃষ্ট প্রলম্বিত অংশের সংখ্যা ২টি। এর মধ্যে ১টি ডেনড্রাইট, অন্যটি অ্যাক্সন। মানব ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্রের সকল কোষই বাইপোলার। পরবর্তীতে এগুলো ইউনিপোলার অথবা মাল্টিপোলার নিউরনে পরিনত হয়। রেটিনা, কক্লিয়া এবং নাকে এ ধরনের নিউরন পাওয়া যায়।

৪. **মাল্টিপোলার** (Multipolar) বা **বহুমেরুযুক্ত নিউরন :** কোষদেহে অনেক প্রলম্বিত অংশ থাকে। এদের একটি অ্যাক্সন ও অন্যগুলো ড্রেনড্রাইট। স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডে এসব নিউরন থাকে।

৫. **সিউডোইউনিপোলার** (Pseduunipolar) বা **ছদ্ম মেরুযুক্ত :** প্রাথমিক অবস্থায় দুটি প্রলম্বিত অংশ থাকে যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মিলিত হয়ে একটিতে পরিণত হয়। দেখতে ইউনিপোলার হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলো বাইপোলার নিউরন থেকে সৃষ্ট। স্পাইনাল গ্যাংগ্লিয়া ও করোটিক স্নায়ু গ্যাংগ্লিয়ায় এ ধরনের নিউরন অবস্থিত।

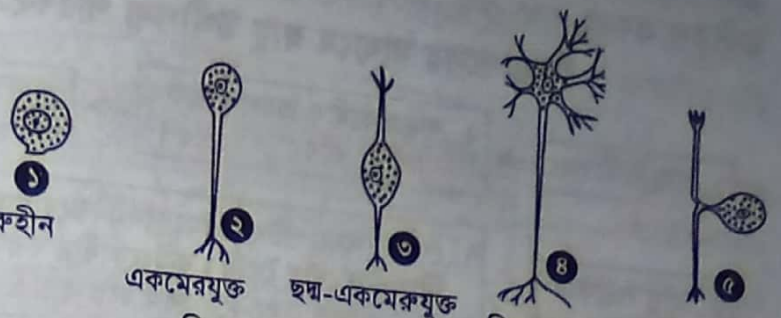

চিত্র ৮.২ : বিভিন্ন প্রকার নিউরন

২. নিউরোগ্লিয়া (Neuroglea)

নিউরন যে যোজক টিস্যুর ভিতরে সুরক্ষিত থাকে তাকে নিউরোগ্লিয়া বলে। চার রকম নিউরোগ্লিয়া হলো– (i) **অ্যাস্ট্রোসাইটস,** (ii) **অলিগোডেনড্রোসাইটস,** (iii) **মাইক্রোগ্লিয়া** এবং (iv) **এপেনডাইমা**।

৩. নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters)

যে রাসায়নিক পদার্থ সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে এক নিউরন থেকে অন্য নিউরন বা পেশি বা গ্রন্থিতে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে তাকে **নিউরোট্রান্সমিটার** বলে। এ পদার্থ প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের ভেসিকলে জমা থাকে ও প্রয়োজনে সিন্যাপটিক ক্লেফটে মুক্ত হয়। অ্যাসিটাইল কোলিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নিউরোট্রান্সমিটার। এ প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

i. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার :** ডোপামিন, GABA, গ্লাইসিন, গ্লুটামেট প্রভৃতি।

ii. **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার :** অ্যাসিটাইল কোলিন, অ্যাড্রেনালিন, নর এড্রেনালিন, হিস্টামিন প্রভৃতি।

৪. সিন্যাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরনে গঠিত হলেও নিউরনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণত একটি নিউরনের অ্যাক্সন-প্রান্ত অন্য নিউরনের ডেনড্রাইট-প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। এভাবে, দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরন শুরু হয়, তাকে **সিন্যাপস** বলে। স্নায়ু উদ্দীপনা সিন্যাপসের মাধ্যমে কেবল একদিকে (এক নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অপর নিউরনের ডেনড্রাইট বা কোষদেহে) পরিবাহিত হয়।

সিন্যাপস এর গঠন : দুটি নিউরনের অংশ মিলিত হয়ে সিন্যাপস গঠন করে। যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশ নেয় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** বলে। সিন্যাপস গঠনকারী অন্য নিউরনকে **পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন** বলে। প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি এবং পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি সম্মিলিতভাবে সিন্যাপস গঠন করে। এ দুটি ঝিল্লির মাঝে প্রায় 20nm (ন্যানোমিটার) ফাঁক থাকে। এ ফাঁকটি সিন্যাপটিক ক্লেফট (synaptic cleft) নামে পরিচিত। প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি প্রকৃতপক্ষে প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তের অংশ। অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তকে **সিন্যাপটিক নব** (synaptic nob) বলে। নবের ভিতরে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোফিলামেন্ট ও নিউরোট্রান্সমিটারযুক্ত ভেসিকল থাকে। পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি হচ্ছে পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের কোষদেহ বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের অংশ।

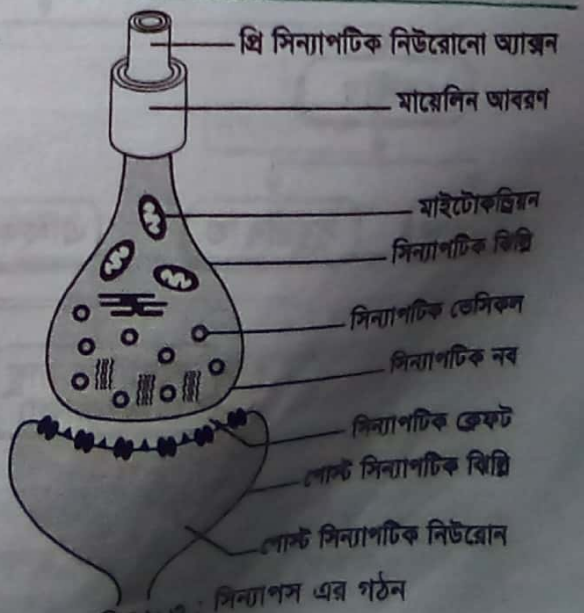

চিত্র ৮.৩ : সিন্যাপস এর গঠন

সিন্যাপস-এর কাজ : (i) নিউরন থেকে নিউরনে তথ্য স্থানান্তর করে (প্রধান কাজ)। (ii) স্নায়ু-উদ্দীপনাকে কেবল একদিকে প্রেরণ

করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে। (iii) বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দেয়। (iv) অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়। (v) প্রচন্ড স্নায়ু-উদ্দীপনায় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে দিয়ে উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়, ফলে কার্যকর (effector) অংশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের প্রবাহ চিত্র নিচে দেখানো হলো।

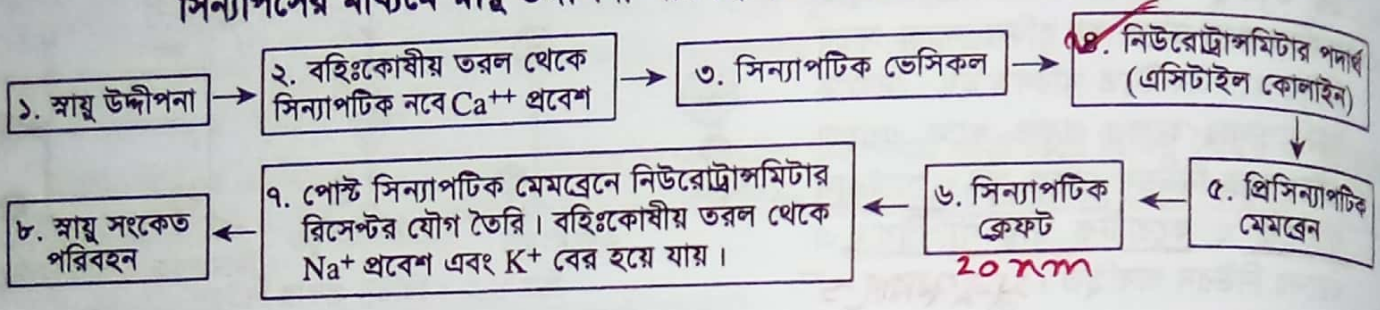

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- **১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** ও **২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র**।

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system) : এটি **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত।

২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কতকগুলো স্নায়ু জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়ে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এসব জোড় স্নায়ুকে **প্রান্তীয় স্নায়ু** বলে। প্রান্তীয় স্নায়ুর সমন্বয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুভাগে বিভক্ত।

ক. ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র (Voluntary nervous system) : এটি ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্নায় নিয়ে গঠিত।

খ. স্বয়ংক্রিয় বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Visceral nervous system) : এগুলো কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রধানত দেহের আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ, যেমন- হৃৎস্পন্দন, পেরিস্ট্যালসিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দুরকম। যথা- **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Sympathetic nervous system) এবং **প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Parasympathetic nervous system)। নিচের ছকে স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো –

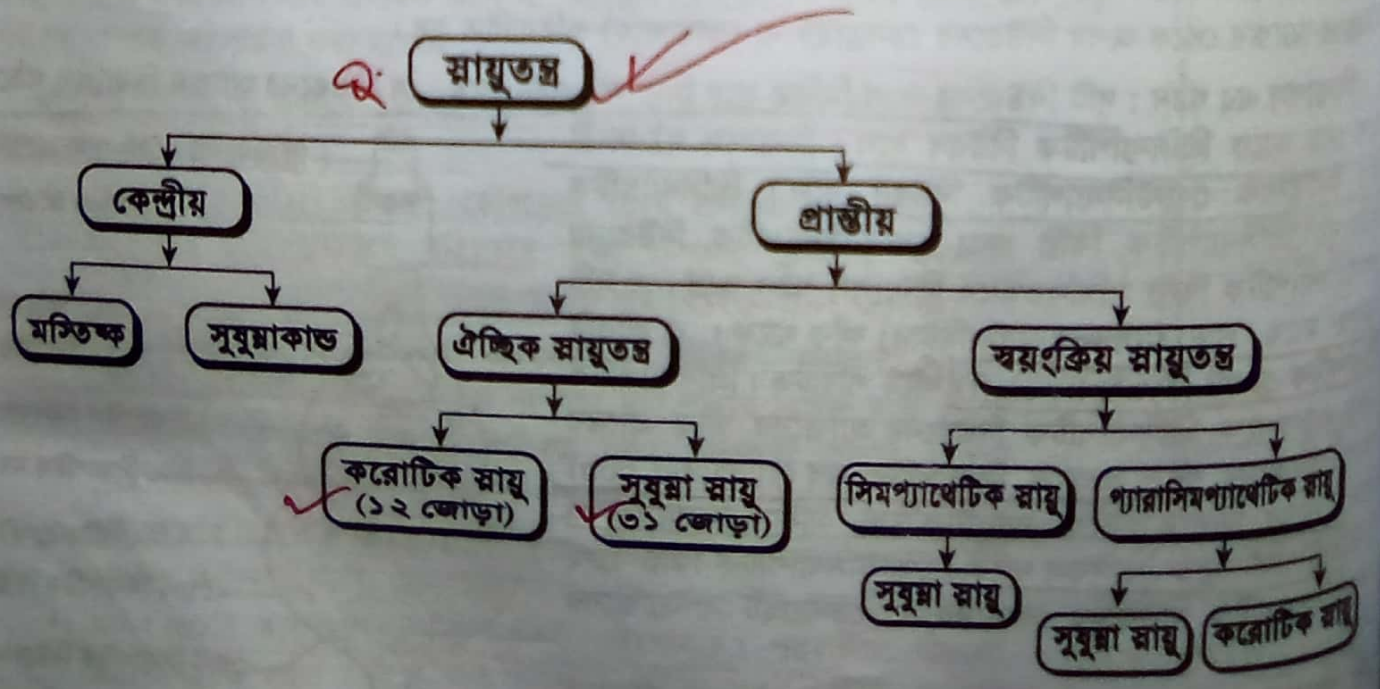

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System – CNS)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্না কাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত। ভ্রূণের এক্টোডার্মের কুঞ্চনের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। **নটোকর্ড**- যা থেকে **মেরুদণ্ড** সৃষ্টি হয় ঠিক তার উপরে স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থান। এক্টোডার্ম ভেতরের দিকে ভাঁজ খেয়ে একটি ফাঁপা **নিউরাল টিউব** (neural tube) দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তার লাভ করে। নিউরাল টিউব ভ্রূণীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ফীতাকার **মস্তিষ্ক** (অগ্রভাগে) এবং একটি লম্বা আকার **সুষুম্না কাণ্ড** গঠন করে। সম্মুখ নিউরাল নালির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের ৩টি ভ্রূণীয় অঞ্চল, যথা- প্রোসেনসেফালন, মেসেনসেফালন এবং রম্বেনসেফালন দেখা যায়। এগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে বিকাশে **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক** এবং **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** গঠন করে।

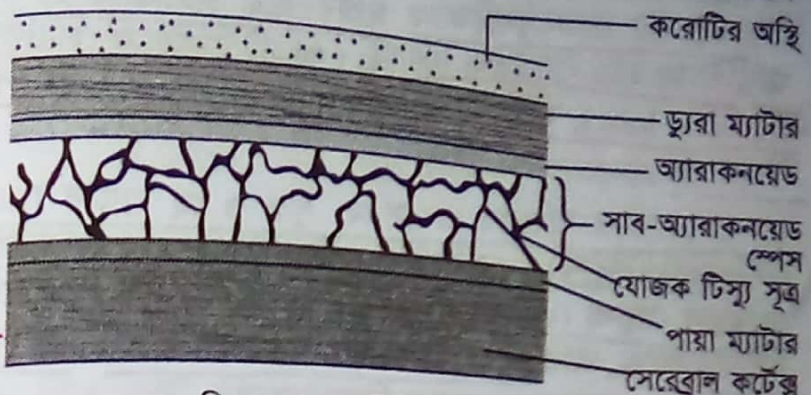

চিত্র ৮.৪ : মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে। একে **মেনিনজেস** বলে। মেনিনজেস ৩টি স্নায়ু ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। যথা- বাইরের ড্যুরাম্যাটার, মধ্যবর্তী অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ভিতরের পায়া ম্যাটার।

মস্তিষ্ক : গঠন, অংশ ও কাজ (Brain : Structure, Parts and Functions)

সুষুম্না কাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ করোটির মধ্যে অবস্থান করে, সেটিই **মস্তিষ্ক**। ভ্রূণ অবস্থায় সুষুম্না কাণ্ডের অগ্রবর্তী দন্ডাকার অংশ ভাঁজ হয়ে পর পর ৩টি বিষমাকৃতির স্ফীতি গঠন করে। স্ফীতি ৩টি মিলে গঠিত হয় মস্তিষ্ক। সামনের দিক থেকে স্ফীত অংশতিনটি হচ্ছে **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক** ও **পশ্চাৎমস্তিষ্ক**। ভ্রূণ যত পরিণত হতে থাকে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জটিলতাও তত বাড়তে থাকে।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকে মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার, গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি এবং এতে প্রায় ১০ বিলিয়ন (এক হাজার কোটি) নিউরন থাকে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে বড়, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মানুষের মস্তিষ্ক ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত :

১. **অগ্রমস্তিষ্ক** (Forebrain or Prosencephalon),
২. **মধ্যমস্তিষ্ক** (Midbrain or Mesencephalon) এবং
৩. **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** (Hindbrain or Rhombencephalon)।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ছক আকারে দেখানো হলো।

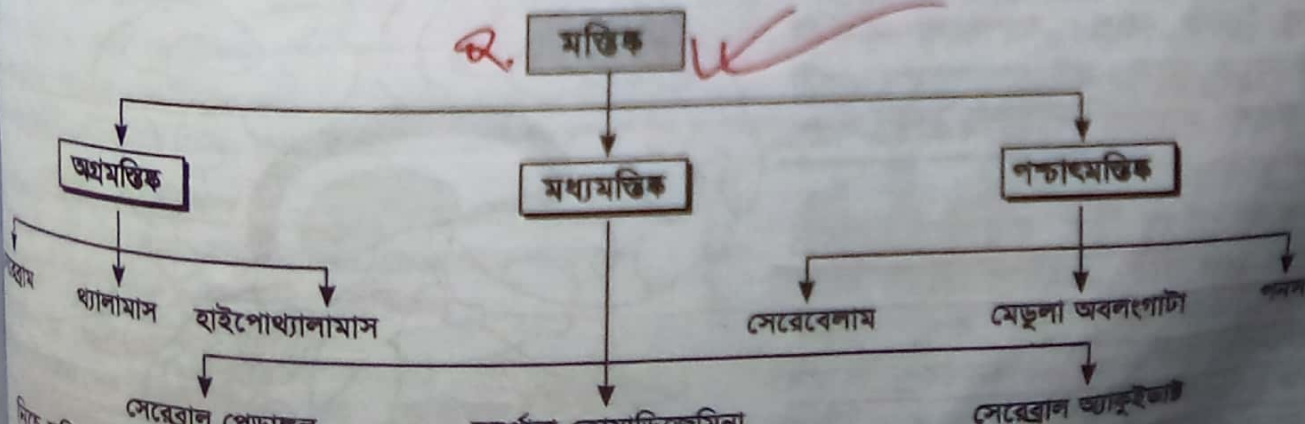

নিম্নে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **অগ্রমস্তিষ্ক** (Prosencephalon)

অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশ হচ্ছে সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস।

ক. **সেরেব্রাম** (Cerebrum) : দুটি বড়, কুন্ডলি পাকানো ও খাঁজবিশিষ্ট খন্ড নিয়ে সেরেব্রাম গঠিত। খন্ডদুটিকে সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার (cerebral hemisphere) বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ (মস্তিষ্কের ওজনের

৮০%-ই হচ্ছে সেরেব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। খন্ডদুটি ভিতরের দিকে **কর্পাস ক্যালোসাম** নামে চওড়া স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত। পৃষ্ঠতল নানা স্থানে ভাঁজ হয়ে উঁচু নিচু অবস্থায় থাকে। উঁচু জায়গাকে **জাইরাস** (gyrus) এবং নিচু জায়গাকে ফিসার বলে।

কয়েকটি ভাঁজ সুগঠিত ও গভীর হয়ে ৩টি প্রশস্ত **ফিসার** (fissure) সৃষ্টি করে (যথা–সেন্ট্রাল, প্যারাইটো-অক্সিপিটাল এবং ল্যাটেরাল ফিসার)। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার **ফ্রন্টাল লোব** (frontal lobe), **প্যারাইটাল লোব** (parietal lobe), **অক্সিপিটাল লোব** (occipital lobe), **টেম্পোরাল লোব** (temporal lobe) ইত্যাদি কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত।

সেরেব্রামের বহিঃস্তর ৩ সে.মি. পুরু ও **গ্রে ম্যাটার** (grey matter)-এ গঠিত। এর নাম **সেরেব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex)। এর নিচের স্তরটি অর্থাৎ সেরেব্রামের অন্তঃস্তর **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter)-এ গঠিত এবং **সেরেব্রাল মেডুলা** (cerebral medulla) নামে পরিচিত। (উল্লেখ্য যে সুষুম্না কান্ডের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার থাকে বাইরের দিকে, আর গ্রে ম্যাটার থাকে ভিতরের দিকে)। ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম পাশকে এবং বাম হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান পাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

Grey matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ধূসর বর্ণের অংশ যা স্নায়ুকোষ, নিউরোগ্লিয়া ও সিন্যাপস নিয়ে গঠিত।
White matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের টিস্যু যা মূলত মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত। মায়েলিনযুক্ত থাকার কারণে টিস্যুটিকে সাদা চকচকে দেখায়।

কাজ : সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে। চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি উন্নত মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. থ্যালামাস (Thalamus) : প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সেরেব্রাল মেডুলায় অবস্থিত এবং গ্রে ম্যাটারে গঠিত একেকটি ডিম্বাকার অঞ্চল। দুটি থ্যালামাই (বহুবচন) একটি যোজক দিয়ে যুক্ত। - ব্যাসাল গ্যাংলিয়ন।

কাজ : এটি সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে (স্নায়ু আবেগ → থ্যালামাস → সেরেব্রাম)। চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র, আবেগের কেন্দ্র ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে।

গ. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) : এটি থ্যালামাসের ঠিক নিচে অবস্থিত, গ্রে ম্যাটার নির্মিত এবং অন্ততঃ এক ডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত অংশ। অংশগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। হাইপোথ্যালামাস একটি সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থির সংগে সংযুক্ত।

কাজ : স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রপিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন নামে দুরকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয় এবং তা পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্যে জমা থাকে।

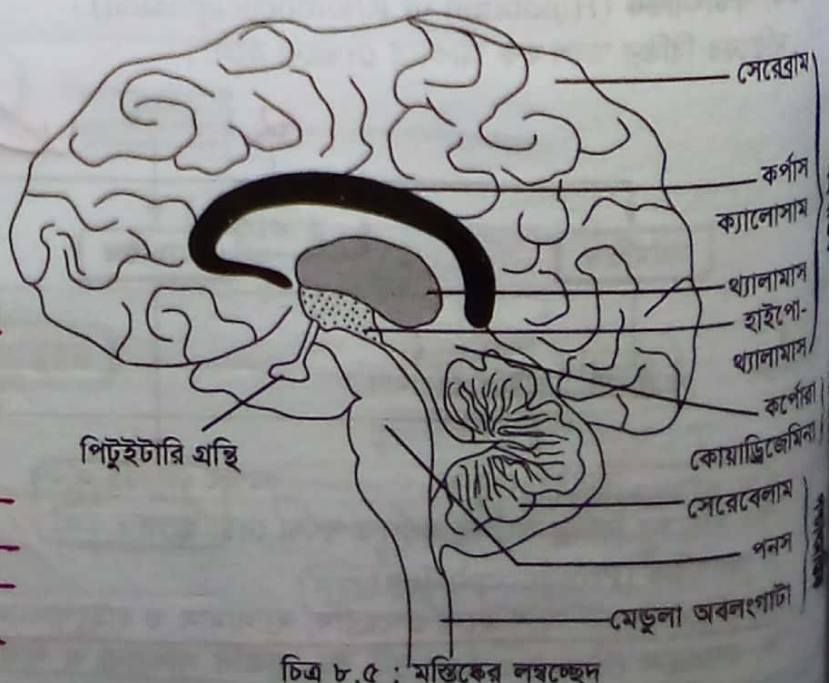

চিত্র ৮.৫ : মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

২. মধ্যমস্তিষ্ক (Mesencephalon)

হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সঙ্কুচিত অংশটি **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন**। এটি অঙ্কীয়দিকে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু এবং পৃষ্ঠদিকে দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত। প্রথম দুটি **সেরেব্রাল পেডাঙ্কল** (cerebral peduncle) এবং শেষের দুটি **কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা** (corpora quadrigemina)। প্রতিটি কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে মোট চারটি খণ্ড গঠন করে। মধ্যমস্তিষ্কের অন্তর্ভাগের তরলপূর্ণ সরু নালি হচ্ছে **সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট** (cerebral aquiduct)। এটি ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকলকে (মস্তিষ্কের গহ্বর) যুক্ত করে।

কাজ : এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

৩. পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Rhombencephalon)

এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎঅংশ এবং ৩টি প্রধান অংশ দিয়ে গঠিত, যথা–**সেরেবেলাম** (cerebellum), **মেডুলা অবলংগাটা** (medulla oblongata) এবং **পনস** (pons)।

ক. সেরেবেলাম : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ যা সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে অবস্থিত, কুন্ডলিকৃত ও দুটি সমগোলার্ধে গঠিত। গোলার্ধদুটি **ভার্মিস** (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। সেরেবেলামের বাইরের অংশ গ্রে ম্যাটার-এ এবং ভিতরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার-এ গঠিত। পূর্ণ বয়স্ক মানুষে সেরেবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

কাজ : ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে। চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

খ. মেডুলা অবলংগাটা : এটি পনস-এর নিচের কিনারা ঘেঁষে প্রসারিত, অনেকটা পিরামিড আকৃতির দন্ডাকার অংশ যা লম্বায় প্রায় ৩ সেমি. চওড়ায় ২ সেমি. এবং স্থূলত্বে ১.২ সেমি.।

কাজ : হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, গলাধঃকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সংকোচন, লালাক্ষরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। বমন, মল-মূত্রত্যাগ, রক্তচাপ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। সুষুম্না কান্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে। ৯ম, ১০ম ও ১১শ করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. পনস : এটি মেডুলা অবলংগাটার উপরের অংশের মেঝেতে অবস্থিত এবং আড়াআড়ি স্নায়ুতন্তু নির্মিত একটি পুরু ব্যান্ড।

কাজ : সেরেবেলাম, সুষুম্না কান্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে। দেহের দুপাশের পেশির কর্মকান্ড সমন্বয় করে। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে সৃষ্ট ৫-৮ম করোটিক স্নায়ু দেহের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে।

মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল / গহ্বর / প্রকোষ্ঠ (Ventricles of Brain)

মস্তিষ্কের গঠন নিরেট নয়, এর অভ্যন্তরভাগে তরলপূর্ণ গহ্বর থাকে । গহ্বরগুলোকে ভেন্ট্রিকল (ventricle) বলে। মানুষের মস্তিষ্কে ৪টি ভেন্ট্রিকল দেখা যায়। এগুলো ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল নামে পরিচিত। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** বলে। মস্তিষ্কের গহ্বরে বিদ্যমান তরল পদার্থের নাম **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড**। নিচে মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

☐ **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** (Lateral Ventricles): অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ভেন্ট্রিকল দুটিকে (১ম ও ২য়) **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** বলে।

☐ **তৃতীয় ভেন্ট্রিকল** (Third Ventricle) : অগ্রমস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের গহ্বরটিকে **৩য় ভেন্ট্রিকল** বলে। **ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামিনা**-র সাহায্যে এটি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকলদুটির সাথে যুক্ত থাকে।

☐ **চতুর্থ ভেন্ট্রিকল** (Fourth Ventricle) : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে। **সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট**-এর মাধ্যমে এটি তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।

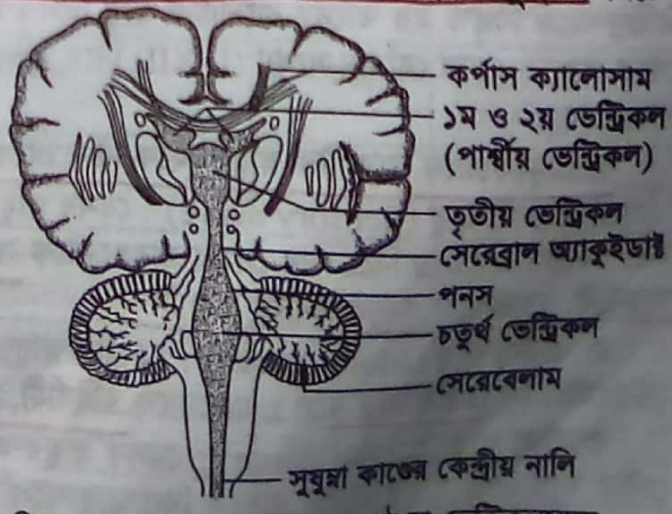

চিত্র ৮.৬: মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকলসমূহ

সেরেব্রাম ও সেরেবেলামের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সেরেব্রাম	সেরেবেলাম
অংশ	সেরেব্রাম অগ্রমস্তিষ্কের অংশ।	সেরেবেলাম পশ্চাৎমস্তিষ্কের অংশ।
আকার ও খণ্ড	মস্তিষ্কের অংশগুলোর মধ্যে বড় ও পাঁচটি খণ্ড বা লোব আছে।	পশ্চাৎমস্তিষ্কের বড় অংশ ও কোন খণ্ড বা লোব নাই।
যোজক	কর্পাস ক্যালোসাম দিয়ে যুক্ত।	ভার্মিস দিয়ে যুক্ত।
কাজ	ঘ্রাণ, শ্রবণ, দৃষ্টি, কথন, স্পর্শ, স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্রবিন্দু।	ভারসাম্য, মাথা ও চোখের সঞ্চালন, পেশি টান, দেহের ভঙ্গি ও স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

ভ্রূণীয় মস্তিষ্ক	প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্ক	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক (প্রোসেনসেফালন)	সেরেব্রাম	দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, কথন, স্পর্শানুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
	থ্যালামাস	গন্ধ ছাড়া অন্যান্য সংবেদী উপাত্তকে সমন্বিত করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে; স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।
	হাইপোথ্যালামাস	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু এবং দেহের আন্তঃসাম্য রক্ষা করে; পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; ক্রোধ, ভীতি, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ, পরিপাক, চলন ও নিদ্রার ছন্দ এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানসিক ও দৈহিক কাজের সমন্বয় সাধন করে।
মধ্যমস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন)	মেসেনসেফালন	অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎমস্তিষ্ক (রম্বেনসেফালন)	সেরেবেলাম	দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে; মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে; পেশির টান ও দেহভঙ্গিমা রক্ষা করে; দেহের সবধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে; হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, শ্বসন, চর্বণ, খাদ্য গলাধঃকরণ, পরিপাক রস ক্ষরণ, ঘাম নিঃসরণ ইত্যাদি ঘটায়। পৌষ্টিকনালির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তনালির সংকোচন-প্রসারণ, লালা নিঃসরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।
	পনস	সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত করে; মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহ (Cranial Nerves of Man)

যেসব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয় তাদের **করোটিক স্নায়ু** বলে। মানুষের মস্তিষ্কে **বারো জোড়া** করোটিক স্নায়ু আছে। সম্মুখ অংশ থেকে পরপর এদের **রোমান সংখ্যা** (I–XII) দিয়ে সূচিত করা হয়। জোড়া স্নায়ুর প্রতিটি প্রতিপাশের অনুরূপ অঙ্গে বিস্তার লাভ করে।

কার্যপ্রকৃতিভেদে করোটিক স্নায়ুসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সংবেদী স্নায়ু** (Sensory nerve) : যেসব স্নায়ু দেহের প্রান্তীয় অঙ্গাদী বা সংবেদী অঙ্গ থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে যায় সেসব স্নায়ুগুলোকে **সংবেদী স্নায়ু** বলে। এ ধরনের স্নায়ু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- **অন্তর্বাহী, সংজ্ঞাবাহী, অনুভূতিবাহী** ইত্যাদি।

২. **চেষ্টীয় স্নায়ু** (Motor nerve) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দেশ বহন করে যেসব স্নায়ু নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছে দেয় সেসবগুলোকে **চেষ্টীয় স্নায়ু** বলে। এগুলোকে **বহির্বাহী, আজ্ঞাবাহী** ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

৩. **মিশ্র স্নায়ু** (Mixed nerve) : যেসব স্নায়ুর এক বা একাধিক গুচ্ছ সংবেদী স্নায়ু এবং এক বা একাধিক গুচ্ছ চেষ্টীয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত সেসব স্নায়ুকে **মিশ্র স্নায়ু** বলে। এগুলো সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করে।

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎস, শাখা, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ

ক্রমিক সংখ্যা	স্নায়ুর নাম	উৎস	শাখা (যদি থাকে)	বিস্তার	প্রকৃতি	কাজ
I	অলফ্যাক্টরি	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি	সংবেদী (sensory)	ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
II	অপটিক	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	চোখের রেটিনা	সংবেদী	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
III	অকুলোমোটর	মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	অক্ষিগালকের পেশি, উর্ধ্ব নেত্রপল্লব উত্তোলন-কারী পেশি ও পিউপিল সংকোচনকারী পেশি	চেষ্টীয় (motor)	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
IV	ট্রকলিয়ার	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	–	চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
V	ট্রাইজেমিনাল	মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ	অপথ্যালমিক	অক্ষিপল্লব, নাসিকার মিউকাস	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যাক্সিলারি	অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যান্ডিবুলার	মুখবিবরের অঙ্কীয়-দেশের পেশি	মিশ্র	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন।
VI	অ্যাবডুসেন্স	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ	–	বহিঃরেক্টাস নামের চক্ষুপেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
VII	ফ্যাসিয়াল	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	প্যালাটাইন	মুখবিবরের ছাদ	সংবেদী	স্বাদ গ্রহণ।
			হায়োম্যাণ্ডি-বুলার	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	মিশ্র	চর্বন, গ্রীবা সঞ্চালন।
VIII	অডিটরি (অ্যাকাউস্টিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	–	অন্তঃকর্ণ	সংবেদী	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা।
IX	গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	–	জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দা	মিশ্র	স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালন।
X	ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	ল্যারিঞ্জিয়াল	স্বরযন্ত্র	মিশ্র	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			কার্ডিয়াক	হৃৎপিণ্ড	মিশ্র	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			গ্যাস্ট্রিক	পাকস্থলি	মিশ্র	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			পালমোনারি	ফুসফুস	মিশ্র	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
XI	স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	–	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	চেষ্টীয়	মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন।
XII	হাইপোগ্লোসাল	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ	–	জিহ্বা ও গ্রীবা	চেষ্টীয়	জিহ্বার বিচলন।

মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর বর্ণনা নিম্নরূপ।

I. অলফ্যাক্টরি (Olfactory) **স্নায়ু :** অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ) থেকে সৃষ্টি হয়ে নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো সংবেদী স্নায়ু এবং মস্তিষ্কে **ঘ্রাণ** উদ্দীপনা বহন করে।

II. অপটিক (Optic) **স্নায়ু :** অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ) থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর ডান ও বাম অপরিটক স্নায়ুদুটি পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে ছেদ ও অতিক্রম করার মাধ্যমে ইংরেজী "X" আকৃতির **অপটিক কায়াজমা** (optic chiasma) গঠন করে। এরপর চোখে প্রবেশ করে রেটিনায় বিস্তৃত হয়। এগুলোকে সংবেদী স্নায়ু চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে।

III. অকুলোমোটর (Oculomotor) **স্নায়ু :** মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখে প্রবেশ করে এবং চোখের ইনফিরিয়র অবলিক ও তিনটি রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো চেষ্টীয় স্নায়ু। চক্ষুপেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

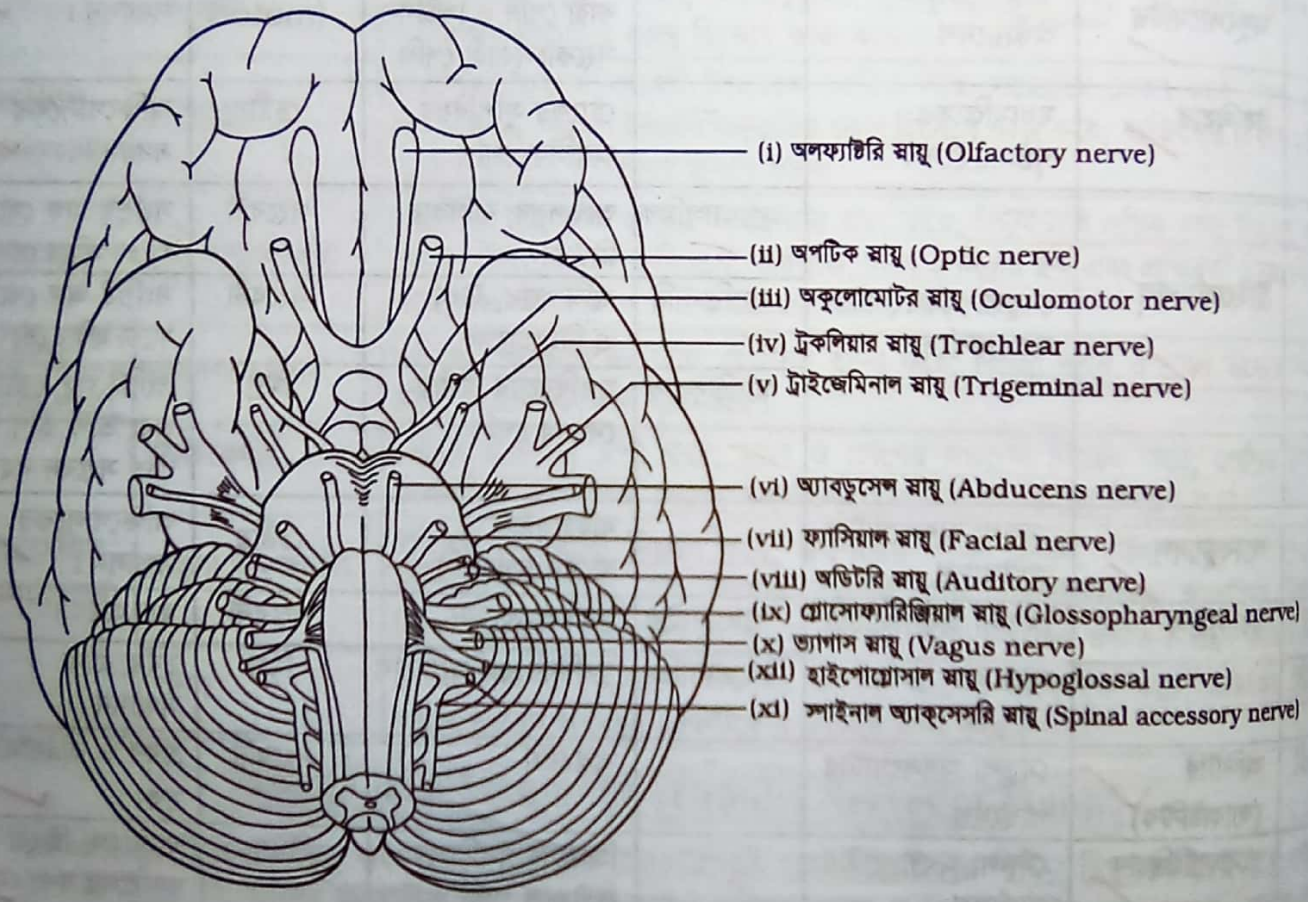

চিত্র ৮.৭ : মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহ

IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear) **স্নায়ু (প্যাথেটিক স্নায়ু) :** মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে সুপিরিয়র অবলিক নামক চক্ষুপেশিতে বিস্তার লাভ করে। এগুলোও চেষ্টীয় স্নায়ু এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal) **স্নায়ু :** মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা–

ক. **অপথ্যালমিক** (Opthalmic) : এটি সবচেয়ে ছোট শাখা। উর্ধ্বঅক্ষিপল্লব, মস্তকের অগ্রভাগের ত্বক এবং নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। শাখাটি সংবেদী প্রকৃতির এবং উল্লেখিত অংশ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

খ. **ম্যাক্সিলারি** (Maxillary) : এ শাখা নিম্ন অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ওষ্ঠ ও উর্ধ্ব চোয়ালের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটিও সংবেদী স্নায়ু এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

গ. **ম্যান্ডিবুলার** (Mandibular) : এ শাখা নিম্নচোয়াল, মুখবিবরের তলদেশের পেশি ও ত্বকে বিস্তৃত হয়। এটি একটি মিশ্র স্নায়ু। নিচের চোয়ালের পেশি ও চামড়ার সংজ্ঞা বহন করে কিন্তু মুখবিবরের পেশিতে চেষ্টীয় স্নায়ুরূপে কাজ করে।

VI. **অ্যাবডুসেন্স** (Abducens) **স্নায়ু :** মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অক্ষিগোলকের বহিঃরেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় স্নায়ু। অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

VII. **ফ্যাসিয়াল** (Facial) **স্নায়ু :** ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর ঠিক পেছনে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এটি একটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। উৎপত্তির পর এ স্নায়ু দুটি শাখায় ভাগ হয়। যথা–

ক. **প্যাল্যাটাইন** (Palatine) : এর শাখা মুখবিবরের ছাদে বিস্তার লাভ করে। এটি একটি সংবেদী স্নায়ু এবং স্বাদ গ্রহণে কাজ করে।

খ. **হায়োম্যান্ডিবুলার** (Hyomandibular) : এ শাখা মুখবিবরের তলদেশ বরাবর অগ্রসর হয়ে কানের পর্দা, নিম্নচোয়ালের সংযোগস্থল, মুখবিবরের তলদেশের মিউকাস পর্দা ও পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি একটি মিশ্র স্নায়ু। আস্বাদন, মুখের অভিব্যক্তি এবং গ্রীবাপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

VIII. **অডিটরি** (Auditory) **স্নায়ু :** ফ্যাসিয়াল স্নায়ুর পশ্চাৎভাগে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। অডিটরি স্নায়ু সংবেদী প্রকৃতির। এটি শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

IX. **গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল** (Glossopharyngeal) **স্নায়ু :** অডিটরি স্নায়ুর পেছনে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এ স্নায়ু জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দাসহ গলবিলের পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র স্নায়ু। স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

X. **ভেগাস** (Vagus) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি স্নায়ু চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। শাখাগুলো হচ্ছে :

ক. **ল্যারিঞ্জিয়াল** (Laryngeal) : স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়।
খ. **কার্ডিয়াক** (Cardiac) : হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সরবরাহ করে।
গ. **গ্যাস্ট্রিক** (Gastric) : পাকস্থলিতে স্নায়ু প্রদান করে।
ঘ. **পালমোনারি** (Pulmonary) : ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে।

ভেগাস একটি মিশ্র স্নায়ু। শাখাগুলো সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

XI. **স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি** (Spinal Accessory) **স্নায়ু :** মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল, স্বরযন্ত্র এবং গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি চেষ্টীয় স্নায়ু এবং গলবিল, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গের পেশি সঞ্চালন করণে কাজ করে।

XII. **হাইপোগ্লোসাল** (Hypoglossal) **স্নায়ু :** সর্বশেষ এ স্নায়ুজোড়া মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে জিহ্বা ও গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু প্রদান করে। এটিও চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু এবং জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

সুষুম্না কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড (Spinal cord)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পশ্চাতের প্রলম্বিত অংশটি **সুষুম্না কাণ্ড**। মেডুলা অবলংগাটার নিচের অংশ থেকে উদগত হয়ে এটি **ফোরামেন ম্যাগনাম** (foramen magnum) নামক করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটি বড় গোল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে মেরুদণ্ডের নিউরাল নালির মাধ্যমে পিছনে উদর কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুষুম্না কাণ্ড মস্তিষ্কের মতো **মেনিনজেস** দিয়ে আবৃত থাকে। এর বাইরের আবরণকে **ডুরাম্যাটার**, এবং ভিতরের আবরণকে **পায়ামাটার** বলে। উভয় পর্দার মাঝখানে তৃতীয় আরেকটি পর্দাকে

চিত্র ৮.৮ : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

অ্যারাকনয়েড বলে। মস্তিষ্কের মতো সুষুম্না কাণ্ডের অভ্যন্তরেও গহ্বর আছে। মস্তিষ্কের গহ্বরকে ভেন্ট্রিকল বলা হলেও সুষুম্না কাণ্ডের গহ্বরকে **কেন্দ্রীয় নালি** বলা হয়। এ গহ্বরের মধ্যে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িড** নামক তরল পদার্থ থাকে। কেন্দ্রীয় নালির চারদিকে নিউরনের কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং সিন্যাপসে গঠিত ইংরেজি 'H' আকৃতির বা প্রজাপতি আকৃতির **গ্রে-ম্যাটার** (grey matter) অঞ্চল অবস্থিত। বস্তুত স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত হওয়ায় এমন ধূসর বর্ণের হয়। গ্রে-ম্যাটার অঞ্চল হোয়াইট ম্যাটার অঞ্চল দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। বাইরের **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter) স্তরে কোন কোষবস্তু নেই, শুধু স্নায়ুসূত্র (অ্যাক্সন) রয়েছে। সুষুম্না কাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া **সুষুম্না স্নায়ু** (spinal nerves) উৎপন্ন হয়। প্রতিটি স্নায়ুর দুটি করে মূল থাকে, যথা- **পৃষ্ঠীয় মূল** (dorsal root) এবং **অঙ্কীয় মূল** (ventral root)। পৃষ্ঠীয় মূলে **পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংগ্লিয়া** (dorsal root ganglia) থাকে যা সংবেদী নিউরনের কোষদেহ দিয়ে গঠিত।

কাজ : সুষুম্না কান্ড **সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত** (simple spinal reflex) সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে যেমন– হাটু ঝাঁকুনি প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। আবার মূত্রথলির সংকোচনের মতো স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত সুষুম্না কাণ্ডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগযোগ মাধ্যম হচ্ছে সুষুম্না কাণ্ড।

মানব সংবেদী অঙ্গ (Human Sensory Organs)

প্রত্যেক জীব নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে সদা সচেতন। সতর্ক না হলে নিজের এবং নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যাবে। নিচুতম জীব থেকে উচ্চতম জীব মানুষ পর্যন্ত সবাই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ। সংবেদন শক্তির মাধ্যমে জীব পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারে। উচ্চতর মেরুদন্ডী প্রাণীতে সংবেদন শক্তি বেশি সুগঠিত। কারণ এদের রয়েছে উন্নত স্নায়ুতন্ত্র ও সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। সংবেদী অঙ্গের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগত অনুভব করতে পারি। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি হচ্ছে মানুষের সংবেদী অঙ্গ। সাধারণ ভাষায় এগুলো **পঞ্চ-ইন্দ্রিয়** নামে পরিচিত। উন্নত স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র, সংবেদী অঙ্গ নিয়ে মানুষ সর্বোতভাবে পৃথিবীর সেরা জীবের আসনে আসীন হয়েছে। নিচে মানুষের দর্শন এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সংবেদী অঙ্গের বিরবণ দেয়া হলো।

চোখ – দর্শনেন্দ্রিয় (Eye – Organ of Vision)

চোখ এমন এক সংবেদী অঙ্গ যা আলোকের মাধ্যমে দৃষ্টি সঞ্চার করে।

মানুষের চোখদুটি মাথার দুপাশে বহিঃকর্ণ ও নাসারন্ধ্রের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। চোখ গোল **অক্ষিগোলক**-এ গঠিত। কয়েকটি **আনুষঙ্গিক অঙ্গ**ও চোখের সাথে জড়িত। চোখের মাত্র $\frac{১}{৬}$ অংশ বাইরে উন্মোচিত, বাকি $\frac{৫}{৬}$ অংশই কোটরের ভিতরে অবস্থান করে। চোখের পর্দায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসে চোখ সিক্ত থাকে।

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন–**অক্ষিগোলক** (eye ball) ও **আনুষঙ্গিক অংশ** (accessory parts)। নিচে মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

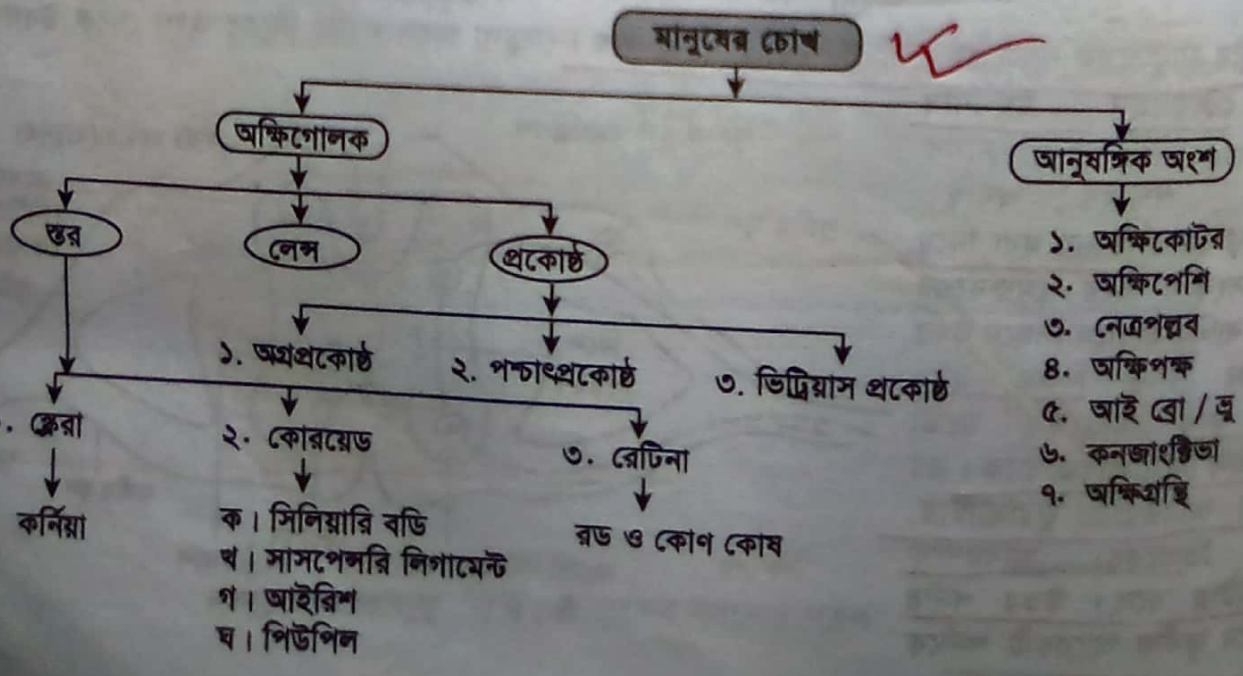

অক্ষিগোলক (Eye ball)

মানুষের চোখ দেখতে গোল বলের মতো হওয়ায় **অক্ষিগোলক** নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোলক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত–A. **অক্ষিগোলকের স্তর,** B. **লেন্স** ও C. **প্রকোষ্ঠ**। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

A. অক্ষিগোলকের স্তর (Layers of Eye ball)

১. স্ক্লেরা (Sclera) বা **স্ক্লেরোটিক স্তর** (Sclerotic layer) : এটি অক্ষিগোলকের বাইরের সাদা, অসচ্ছ ও তন্তুময় স্তর। এটি অস্বচ্ছ হলেও চোখের সামনের দিকে খুব পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দায় পরিণত হয়েছে। স্বচ্ছ পর্দাটির নাম **কর্নিয়া** (cornea)। কর্নিয়া পুনরায় আরও একটি পাতলা স্বচ্ছ পর্দা বা **কনজাংক্টিভা** (conjunctiva)-য় আবৃত। স্ক্লেরা চোখের আকৃতি বজায় রাখে, চোখকে সংরক্ষণ করে ও পেশি সংযুক্ত রাখে। কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে চোখের ভিতর আলো প্রবেশ করে। কনজাংক্টিভা চোখকে ধূলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

চিত্র ৮.৯ : মানুষের চোখ (বাহ্যিক গঠন)

২. কোরয়েড (Choroid) : এটি স্ক্লেরার নিচে অবস্থিত রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ ও **মেলানিন** (melanin) রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর। মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি কালো দেখায়।

কোরয়েড নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

❐ **আইরিশ** (Iris) : কর্নিয়ার ঠিক পেছনে চোখের উন্মুক্ত অংশে কোরয়েড স্তরটি স্ক্লেরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বৃত্তাকার থালার মতো যে অংশ গঠন করে সেটি আইরিশ। দুধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে আইরিশ গঠিত।

কাজ : লেন্সে পরিমিত আলো প্রবেশের জন্য আইরিশ পেশির সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে পিউপিলকে ছোট ও বড় করে।

❐ **সিলিয়ারি বডি** (Ciliary body) : এটি একটি স্থূল বলয়াকার অংশ। আইরিশ ও কোরয়েডের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। সিলিয় বলয়, সিলিয় প্রবর্ধক ও সিলিয়ারি পেশি নিয়ে এটি গঠিত।

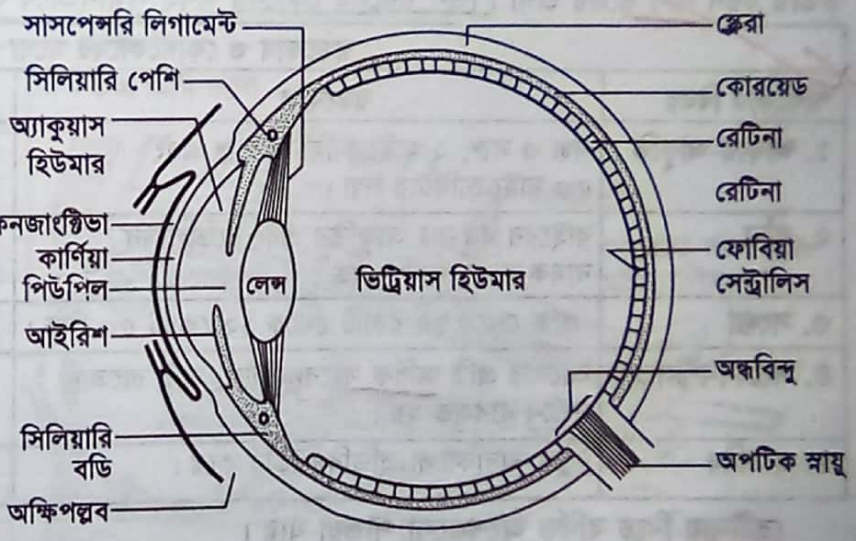

চিত্র ৮.১০ : মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদ

কাজ : সিলিয় পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়। সিলিয়ারি বডি অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন করে।

❐ **সাসপেন্সরি লিগামেন্ট** (Suspensory ligament) : লেন্সের চতুর্দিক বেষ্টনকারী লিগামেন্টকে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট বলে। এর অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সাহায্যে লেন্সটি যথাস্থানে অবস্থান করে এবং সিলিয়ারি বডির সাথে সংযুক্ত থাকে।

❐ **পিউপিল** (Pupil) : পিউপিল হচ্ছে আইরিশের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং বৃত্তাকার ও অরীয় পেশিতে বেষ্টিত একটি ছোট ছিদ্রবিশেষ। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী অরীয় ও বৃত্তাকার পেশির সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিলটি প্রয়োজন মতো ছোট-বড় করা যায়। অরীয় পেশি প্রসারিত হলে এবং বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হলে পিউপিল ছোট হয়। আবার বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হলে পিউপিল বড় হয়ে অক্ষিগোলকের ভিতর আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

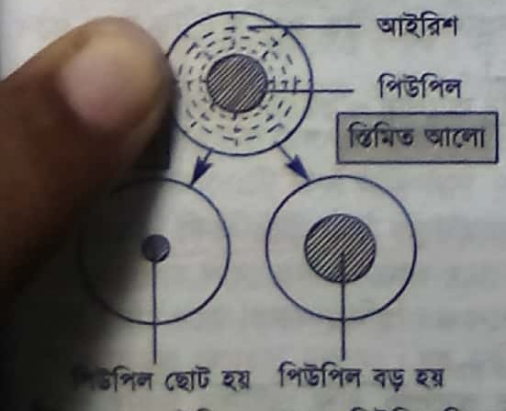

চিত্র ৮.১১ : আইরিশের মাধ্যমে পিউপিল নিয়ন্ত্রণ

কাজ : পিউপিলের মধ্য দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে। মৃদু আলোতে পিউপিল বড় এবং উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে পিউপিল ছোট হয়।

৩. রেটিনা (Retina) **:** রেটিনা হচ্ছে অক্ষিগোলকের প্রাচীরের সর্বাপেক্ষা ভিতরের স্তর এবং **একমাত্র আলোক সংবেদী** অংশ। এটি ১০টি উপস্তরে গঠিত। বাইরের কোরয়েড সংলগ্ন স্তরটি রঞ্জক পদার্থবিশিষ্ট আলোক সংবেদী কোষস্তর দিয়ে গঠিত। চোখের সামনের দিকে রেটিনা সিলিয়ারি অঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। রেটিনার একটি স্থানে অপটিক করোটিক স্নায়ু প্রবেশ করে। এতে দুধরনের আলো-সংবেদী কোষ আছে, যথা-**রড** (rod) ও **কোণ** (cone) কোষ। রডকোষগুলো লম্বাটে। এতে **রডোপসিন** (rhodopsin) নামক আলোক সংবেদী রঞ্জক পদার্থ ও ভিটামিন A থাকে। কোণকোষগুলো কোণাকার ও **আয়োডপসিন** (iodopsin) নামক প্রোটিনযুক্ত। চোখে রডকোষের সংখ্যা ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ। অপরদিকে কোণকোষের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ। কোণকোষগুলো উজ্জ্বল আলো ও রঙিন বস্তু দর্শনের জন্য এবং ছবির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী। রডকোষগুলো অনুজ্জ্বল আলোতে (dim light) দর্শনের উপযোগী।

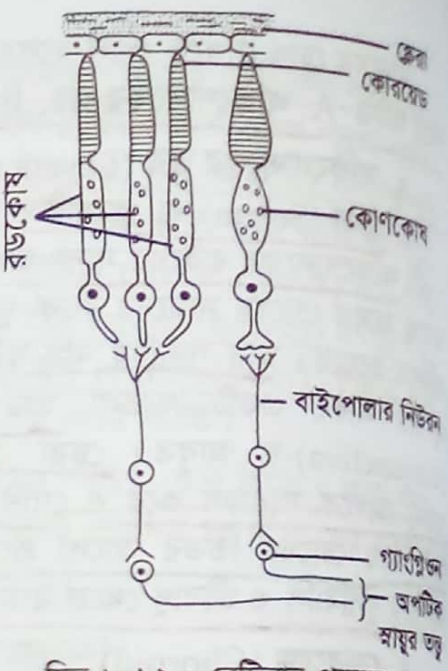

চিত্র ৮.১২ : রেটিনার প্রস্থচ্ছেদ

তিন ধরনের কোণকোষ আছে বলে মনে করা হয়। প্রথম ধরনের কোণকোষ লাল রং, দ্বিতীয় ধরন সবুজ রং এবং তৃতীয় ধরন নীল রঙের জন্য। তিন ধরনের কোষের সবই সমানভাবে উদ্দীপ্ত হলে সাদা রং দৃষ্ট হয়।

রডকোষ ও কোণকোষের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রডকোষ	কোণকোষ
১. আকার-আকৃতি	লম্বা ও সরু, ২ মাইক্রোমিটার পুরু এবং ৫০ মাইক্রোমিটার লম্বা।	খাটো ও প্রশস্ত, ৩-৫ মাইক্রোমিটার পুরু ও ৪০ মাইক্রোমিটার লম্বা।
২. গঠন	বাইরের খণ্ড রড আকৃতির এবং রডোপসিন নামক রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ।	বাইরের খণ্ড কোণ আকৃতির এবং আয়োডপসিন নামক রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ।
৩. সংখ্যা	প্রতি চোখে ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।	প্রতি চোখে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ।
৪. সংবেদনশীলতা	আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীল, তাই রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়।	আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল, তাই দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়।
৫. প্রতিবিম্ব	বস্তুর সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	বস্তুর রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

রেটিনায় নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

- **অন্ধবিন্দু** (Blind spot) : অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে নিউরনের অ্যাক্সনগুলো মিলিত হয়ে **অপটিক স্নায়ু** গঠন করে, সে বিন্দুটি **অন্ধবিন্দু**। এখানে কোনো রডকোষ বা কোণকোষ থাকে না, তাই আলোক সংবেদী নয়।
- **ফোবিয়া সেন্ট্রালিস** (Fovea centralis) : অন্ধবিন্দুর কাছাকাছি রেটিনার একটি অংশে প্রচুর কোণকোষ দেখা যায়। এ অংশ **পীতবিন্দু** (yellow spot) বা **ফোবিয়া সেন্ট্রালিস**। এটি অতিরিক্ত আলো সংবেদী, তাই এখানে সবচেয়ে ভাল প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।
- **অপটিক স্নায়ু** : রেটিনা স্তরে গ্যাংগ্লিওনসমৃদ্ধ নিউরনগুলোর অ্যাক্সনগুলো একত্রিত হয়ে **অপটিক স্নায়ু** গঠন করে। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

রেটিনার কাজ : রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এর কোণকোষগুলো তীব্র আলোয় ও রডকোষগুলো অল্প আলোয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। পীতবিন্দুতে দর্শনীয় বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

B. লেন্স (Lens)

পিউপিলের পেছনে অবস্থিত ও সিলিয়ারি বডির সাথে সাসপেন্সরি লিগামেন্টযুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা একটি স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল চাকতির মতো অংশকে **লেন্স** বলে। লেন্সের পেছনের চেয়ে সামনের দিক বেশি চাপা, নরম ও কিছুটা হলুদ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি আরো চাপা, হলদে ও দৃঢ় হয়, ফলে এর স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। লেন্সে রক্ত সরবরাহ নেই। সিলিয় পেশির সংকোচন-প্রসারণে লেন্সও সংকুচিত-প্রসারিত হয়। লেন্সের সাহায্যে আলোক রশ্মি বক্রতা প্রাপ্ত হয়ে রেটিনায় নিক্ষিপ্ত হয়। লেন্সের মাধ্যমে বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়।

C. অক্ষিগোলকের গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ (Chambers)

অক্ষিগোলকে তরল পদার্থ পূর্ণ তিনটি গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ আছে।

i. **অগ্রপ্রকোষ্ঠ** (Anterior chamber) : এটি কর্নিয়া ও আইরিশের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ। **অ্যাকুয়াস হিউমার** (aquous humour) নামক পানির মতো তরল পদার্থ দিয়ে প্রকোষ্ঠটি পূর্ণ থাকে।

ii. **পশ্চাৎপ্রকোষ্ঠ** (Posterior chamber) : এটিও অ্যাকুয়াস হিউমারে পূর্ণ এবং আইরিশ ও লেন্সের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত প্রকোষ্ঠ।

iii. **ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ** (Vitrious chamber) : এটি লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী বড় প্রকোষ্ঠ যা **ভিট্রিয়াস হিউমার** (vitreous humour) নামক জেলির মতো স্বচ্ছ চটচটে পদার্থে পূর্ণ।

ভিট্রিয়াস হিউমার প্রকৃত পক্ষে ডিমের সাদা অংশের মতো ঘন কিন্তু স্বচ্ছ। ৯৯% পানি এবং ১% কোলাজেন ও হায়াল্যুরোনিক এসিড (hyaluronic acid)-এ ভিট্রিয়াস হিউমার গঠিত। ভিট্রিয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে এবং অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।

অ্যাকুয়াস হিউমার আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে, চোখের সম্মুখ অংশের আকৃতি ঠিক রাখে এবং লেন্স ও কর্নিয়ায় পুষ্টি জোগায়।

চোখের আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory Parts of Eye)

১. অক্ষিকোটর (Orbit) : এটি মস্তক ও মুখমণ্ডলের অস্থি দিয়ে নির্মিত প্রাচীরে আবদ্ধ একটি ফাঁপা গর্তবিশেষ। এতে অক্ষিগোলক সুরক্ষিত থাকে।

২. অক্ষিপেশি (Eye muscle) : প্রতিটি অক্ষিগোলক ৬টি করে অক্ষিপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থান করে। এর মধ্যে ৪টি **রেক্টাস** (rectus) পেশি এবং ২টি **অবলিক** (oblique) পেশি।

চিত্র ৮.১৩ : চোখের আনুষঙ্গিক অংশ

- **মিডিয়াল রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে ভিতরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ল্যাটারাল রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে বাইরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **সুপিরিয়র রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে উপর দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ইনফিরিয়র রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে নিচের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **সুপিরিয়র অবলিক পেশি** : অক্ষিগোলককে অপটিক স্নায়ু ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অক্ষ বরাবর ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ইনফিরিয়র অবলিক পেশি** : সুপিরিয়র অবলিক পেশির ঠিক বিপরীতধর্মী একটি পেশি।

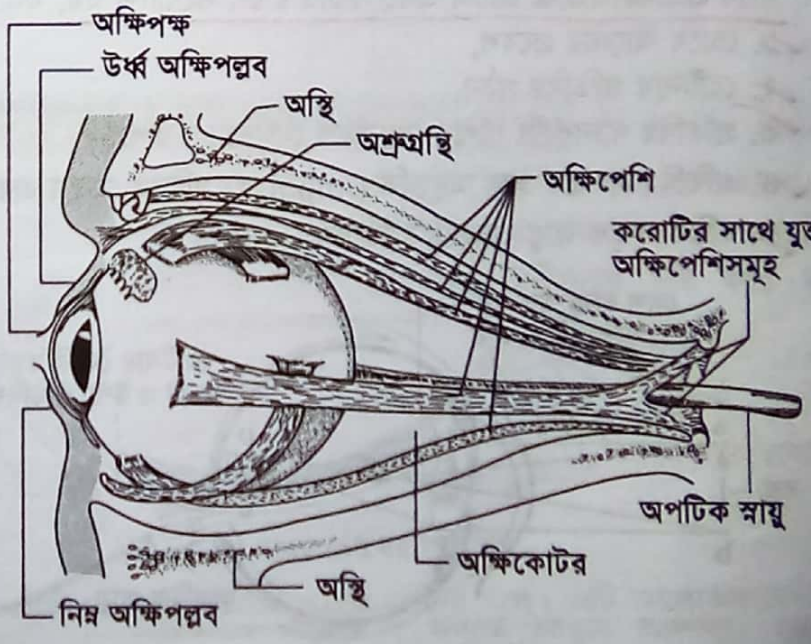

উপরোক্ত পেশিগুলো চোখকে অক্ষিকোটরের স্বস্থানে আটকে রাখে এবং অক্ষিগোলককে ঘুরতে সাহায্য করে।

৩. অক্ষিপল্লব বা চোখের পাতা (Eyelid) : প্রত্যেক চোখের উপরে ও নিচে রোমযুক্ত পেশিবহুল পাতার মতো দুটি পর্দা থাকে। উপরেরটি **ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব** ও নিচেরটি **নিম্ন অক্ষিপল্লব**। এছাড়া আরো একটি অক্ষিপত্র রয়েছে যা **উপ-অক্ষিপল্লব** বা **নিকটিটেটিং পর্দা** (nictitating membrane) নামে পরিচিত। এটি মানুষের একটি **লুপ্তপ্রায় নিষ্ক্রিয় অঙ্গ** হিসেবে উভয় চোখের ভিতরের কোণায় অবস্থিত এবং দেখতে লালচে রঙের মাংসপিণ্ডের মতো। অক্ষিপল্লব ধূলাবালি, তীব্র আলো, বাতাস থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৪. অক্ষিপক্ষ (Eyelash) : চোখের পাতার লোমকে **অক্ষিপক্ষ** বলে। এগুলো চোখে ধুলাবালি প্রবেশে বাধা দেয়।

৫. আই ব্রো (Eye brow) : চোখের পাতার উপর অংশের লোমকে **আই ব্রো** বলে। কপাল থেকে গড়িয়ে আসা ঘামের চোখে প্রবেশ প্রতিহত করাই এর কাজ।

৬. অক্ষিগ্রন্থি (Eye gland) : প্রত্যেক চোখে ৩ ধরনের গ্রন্থি থাকে, যথা–**অশ্রুগ্রন্থি** (lacrimal glands), **হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি** (harderian glands) এবং **মেবোমিয়ান গ্রন্থি** (meibomian glands)। হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থি নিঃসৃত তৈলাক্ত ক্ষরণ অক্ষিপল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে। অশ্রুগ্রন্থি নিঃসৃত **অশ্রু** নামে এক ধরনের লবণাক্ত (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি) ও জীবাণুরোধক তরল (লাইসোজাইম এনজাইম) ক্ষরণ করে কনজাংক্টিভাকে নরম, সিক্ত, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখে।

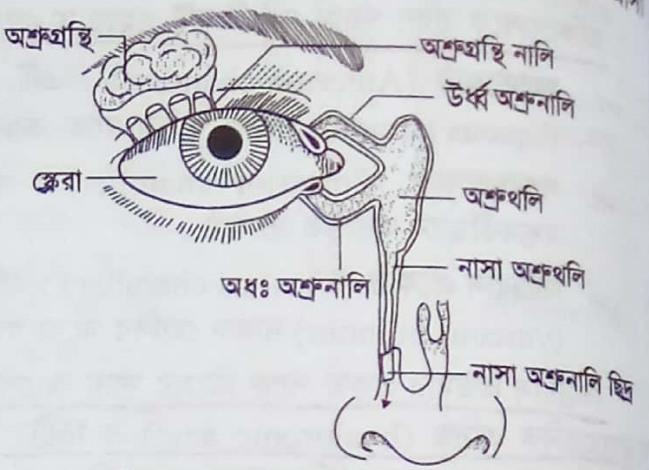

চিত্র ৮.১৪ : অশ্রুগ্রন্থি ও অশ্রুনালির অবস্থান

৭. কনজাংক্টিভা (Conjunctiva) : আইরিশের উপরের অংশ ছাড়া অক্ষিপল্লবের ভিতরের অংশ, ক্লেরার অগ্রাংশ এবং কর্নিয়ার সামনের অংশ যে স্বচ্ছ পাতলা মিউকাস স্তরে আবৃত থাকে তার নাম কনজাংক্টিভা। এটি চোখকে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করে।

প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া (Formation of Image and Mechanism of Vision)

দর্শন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং পাঁচটি ধাপে সংঘটিত হয়, যথা–

১. চোখে আলোর প্রবেশ,
২. রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠন,
৩. প্রতিবিম্ব গঠনকারী রশ্মির বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর,
৪. প্রতিবিম্ব সম্পর্কে স্নায়ু অনুভূতি (impulse) মস্তিষ্কে প্রেরণ এবং
৫. মস্তিষ্ক কর্তৃক স্নায়ু অনুভূতির বিশ্লেষণ ও দর্শন।

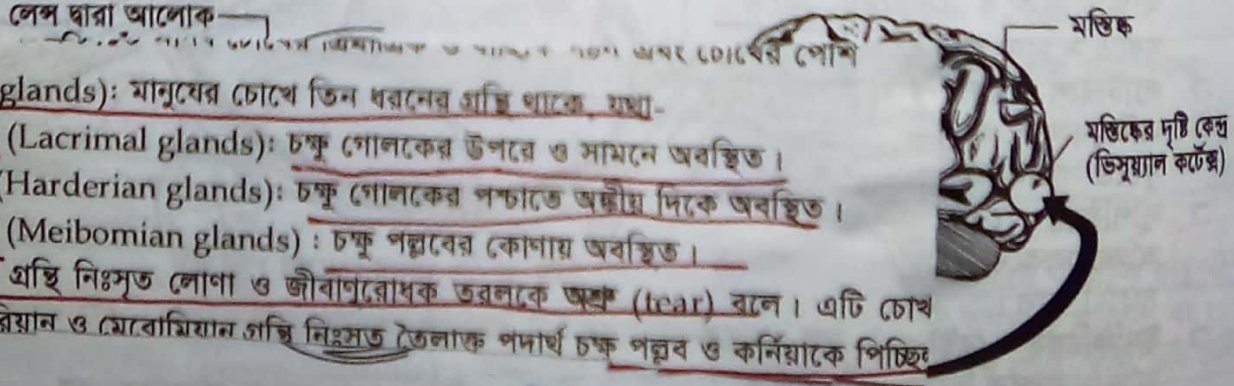

চিত্র ৮.১৫ : দর্শন কৌশল

৩। **চক্ষু গ্রন্থি** (Eye glands): মানুষের চোখে তিন ধরনের গ্রন্থি থাকে, যথা-

- **ল্যাক্রাইমাল গ্রন্থি** (Lacrimal glands): চক্ষু গোলকের উপরে ও সামনে অবস্থিত।
- **হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি** (Harderian glands): চক্ষু গোলকের পশ্চাতে অন্তীয় দিকে অবস্থিত।
- **মেবোমিয়ান গ্রন্থি** (Meibomian glands) : চক্ষু পল্লবের কোণায় অবস্থিত।

কাজ: ল্যাক্রাইমাল গ্রন্থি নিঃসৃত লোণা ও জীবাণুরোধক তরলকে **অশ্রু** (tear) বলে। এটি চোখ ণ মুক্ত রাখে। হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থি নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ চক্ষু পল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছি

আমরা যে বস্তুকে দেখি, আলোকিত সে বস্তু থেকে আলোক রশ্মি কর্নিয়ায় পতিত হয়। স্বচ্ছ কর্নিয়ায় প্রতিসরিত আলোক রশ্মি পিউপিলের মাধ্যমে লেন্সে পতিত হয়। দ্বিউত্তল লেন্স এই আলোক রশ্মিকে পুনরায় প্রয়োজনমত প্রতিসরণের মাধ্যমে রেটিনায় প্রতিফলিত করে। ফলে রেটিনার উপর বস্তুর একটি উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার আলোক সংবেদী কোষ (রডকোষ ও কোণকোষ)-কে উদ্দীপ্ত (stimulate) করে। আলোক সংবেদী কোষের এ অনুভূতি বাইপোলার কোষ, গ্যাংগ্লিওন কোষ এবং অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অপটিক লোবের দৃষ্টি কেন্দ্র বা ভিসুয়্যাল কর্টেক্সে (visual cortex) পৌছায়। এ অঞ্চলে স্নায়ু অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত উল্টা প্রতিবিম্বের তথ্য বিশ্লেষণ হয় ফলে মানুষ বস্তুটিকে সোজা দেখতে পায়।

দর্শন কৌশলের গতিপথ হলো–

আলোকরশ্মি → কর্নিয়া → অ্যাকুয়াস হিউমার → পিউপিল → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → রেটিনা।

উপযোজন (Accommodation)

দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যকার দূরত্বের পরিবর্তন না করেই সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সংকোচন বা প্রসারণে ও লেন্সের বক্রতার তথা ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে যেকোনো দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে সমান স্পষ্ট দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে সে প্রক্রিয়াকে **উপযোজন** বলে। চোখ থেকে ৬ মিটার দূরত্বে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বাভাবিকভাবে রেটিনায় প্রতিফলিত হয়। এ দূরত্বের কম বেশি হলে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় ফোকাসের জন্য উপযোজন প্রয়োজন। মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে উপযোজন একটি বৈশিষ্ট্য। এ সময় সিলিয়ারি বডির বৃত্তাকার পেশির সংকোচনের ফলে সাসপেনসরি লিগামেন্টের প্রসারণ ঘটে। ফলে লেন্সের বক্রতা বাড়ে ও খাটো হয়। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গিয়ে কাছের বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। দূরের বস্তু দেখার সময় এর উল্টোটি ঘটে। অর্থাৎ সিলিয়ারি বডির বৃত্তাকার পেশির প্রসারণ, সাসপেনসরি লিগামেন্টের সংকোচনে লেন্সের বক্রতা কমে, লেন্স সরু ও লম্বা হয় এবং ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায় এবং দূরের বস্তু থেকে আলোকরশ্মি রেটিনায় পড়ে প্রতিবিম্ব গঠন করে। তখন বস্তুটি দেখা যায়। যে দৃষ্টিতে কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না তাকে **হাইপারমেট্রোপিয়া** বলে। উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহারে এ রোগ সেরে যায়।

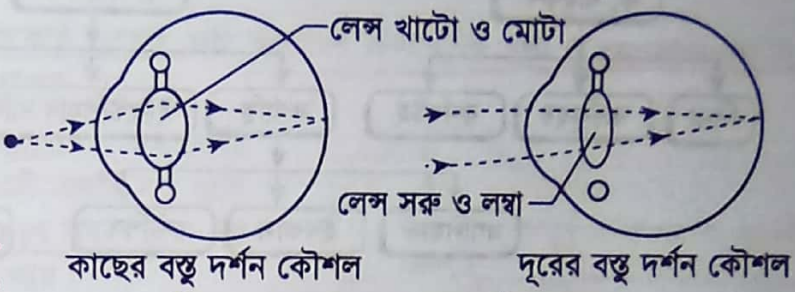

চিত্র ৮.১৬ : মানুষের চোখের উপযোজন

দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision) বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (Sterioscopic vision)

মানুষের দৃষ্টিকে **দ্বিনেত্র দৃষ্টি** বলে। কারণ আমরা কোনো দৃশ্যযোগ্য বস্তু একই সাথে দুচোখের সাহায্যে এককভাবে দেখতে পাই। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় পড়লে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে (visual cortex) একটি মাত্র প্রতিবিম্বে একত্রীভূত হয়, ফলে আমরা দুচোখে একটি বস্তুকে এককভাবে দেখি।

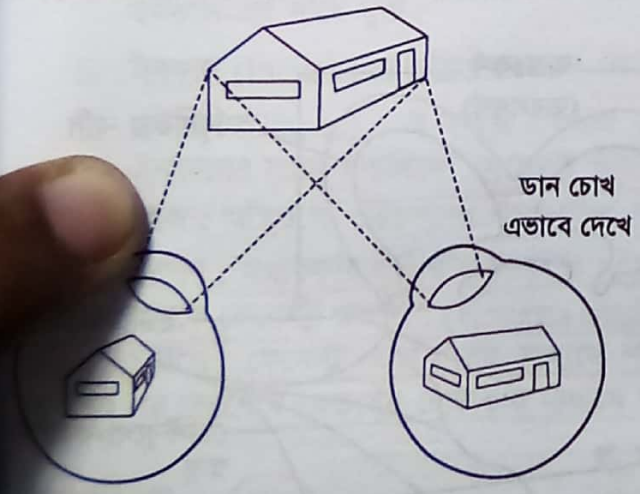

চিত্র ৮.১৭ : মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি

মানুষের চোখদুটি মাথার সামনে ৬.৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ফলে কোনো বস্তু দেখার সময় প্রত্যেক চোখ বস্তুটির একটি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিবিম্ব দুটির একটি থেকে অন্যটি কিছুটা আলাদা। উভয় উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্ক দুটি উদ্দীপনাকে সমন্বয় সাধন করে। ফলে বস্তুর একটি **ত্রিমাত্রিক** (three dimensional) চিত্র দেখা যায়।

দ্বিনেত্র দৃষ্টির শর্ত : ১. নির্দিষ্ট বস্তুতে নিবদ্ধ করার জন্য অক্ষিপেশিকে সঠিকভাবে সংকুচিত হতে হবে। ২. দুচোখের রেটিনায় সদৃশ বিন্দুর উপস্থিতি থাকতে হবে। ৩. দুচোখের রেটিনায় প্রায় একইরকম প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতে হবে। ৪. দুটি বীক্ষণক্ষেত্রকে এক জায়গায় পরস্পর মিলে যেতে হবে।

মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি থাকার সুবিধা : ১. দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে একইভাবে দেখে। ২. কোনো বস্তুকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে। ৩. দৃষ্টিক্ষেত্র অনেক বড় হয়। ৪. বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। ৫. বিভিন্ন কাজ সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

কান– শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ (Ear– Hearing and Equilibrium organ)

কান এমন এক বিশেষ ইন্দ্রিয় যা একাধারে **শ্রবণ** ও দেহের **ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ**-এ অংশ গ্রহণ করে। মানুষের মাথার দুপাশে ও চোখের পেছনে করোটির শ্রুতিকোটরে দুটি কান অবস্থান করে।

মানুষের প্রতিটি কান ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা–**বহিঃকর্ণ** (External ear), **মধ্যকর্ণ** (Middle ear) ও **অন্তঃকর্ণ** (Internal ear)। কানের অংশগুলো নিচে ছক আকারে দেখানো হলো।

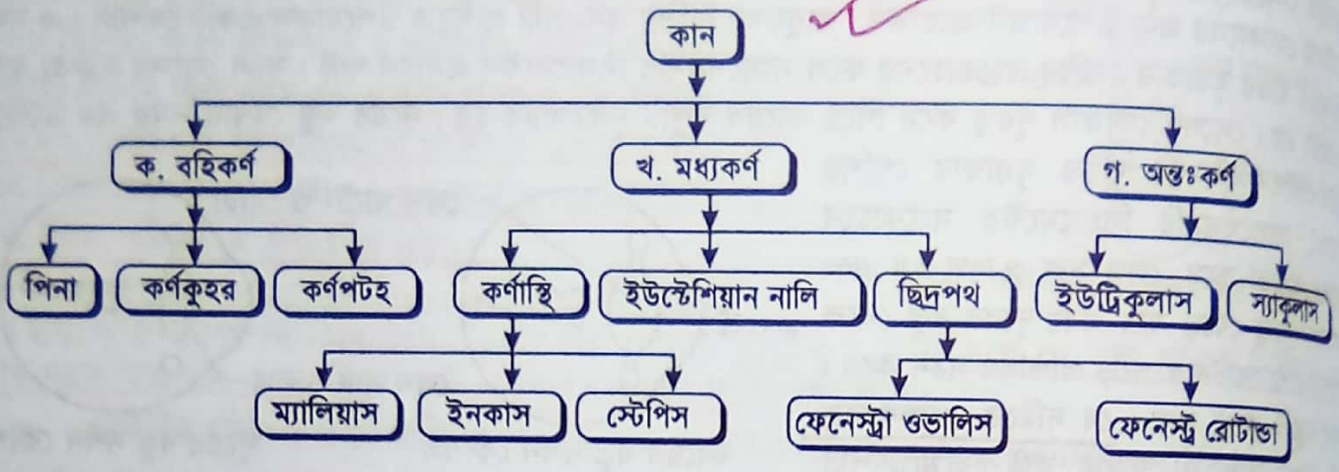

নিচে কানের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. বহিঃকর্ণ (External ear)

বাইরের দিক থেকে এটি কানের প্রথম ভাগ এবং নিম্নোক্ত ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত।

১. পিনা (Pinna) বা **কর্ণছত্র :** এটি মাথার দুপাশে অবস্থিত ও তরুণাস্থি নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত ও দৃশ্যমান অংশ। এর অভ্যন্তরে পেশিতন্তু থাকলেও মানুষ কান নাড়াতে পারে না। কোনো শব্দ ভালভাবে শোনার জন্য যে দিক

চিত্র ৮.১৮ : মানুষের কানের গঠন

থেকে শব্দ আসে সেদিকে মাথাসহ কানের ছিদ্রকে ঘোরাতে হয়। শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রেরণ করা পিনার কাজ।

২. বহিঃঅডিটরি মিটাস (External auditory meatus) বা **কর্ণকুহর :** পিনার কেন্দ্রে কানের বহিঃছিদ্র থেকে যে সরু নালিপথ কানের টিমপেনিক পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত তার নাম **বহিঃঅডিটরি মিটাস**। এর বাইরের দুই-তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দিয়ে এবং এক-তৃতীয়াংশ অস্থিতে গঠিত। এটি মোমগ্রন্থি ও সূক্ষ্ম রোমযুক্ত ত্বকে আবৃত। এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ লম্বভাবে টিমপেনিক পর্দায় পৌঁছে। এতে অবস্থিত মোম ও লোম কানের ভেতরে ধুলাবালি প্রবেশে বাধা দেয় এবং জীবাণু নাশ করে। টিমপেনিক পর্দার অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।

৩. টিমপেনিক পর্দা (Tympanic membrane) বা **কর্ণপটহ** : বহিঃঅডিটরি মিটাসের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ডিম্বাকার, স্থিতিস্থাপক পর্দাকে টিমপেনিক পর্দা বলে। এর বাইরের দিক অবতল, ভেতরের দিক উত্তল। এর সাথে মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস অস্থি যুক্ত থাকে। বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক করে রাখা, শব্দতরঙ্গে কেঁপে উঠা এবং শব্দতরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবহন করা টিমপেনিক পর্দার কাজ।

খ. মধ্যকর্ণ (Middle ear)

মধ্যকর্ণ একটি অসম আকৃতির বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ এবং করোটির **টিমপেনিক বুলা** (tympanic bulla)-র ভেতর অবস্থিত। এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

১. ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian canal) **:** মধ্যকর্ণের তলদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত এটি একটি সরু নালি বিশেষ। টিমপেনিক পর্দার উভয় পাশের বায়ুর চাপ সমান রাখা এর কাজ। ফলে কর্ণপটহ ফেটে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

২. কর্ণাস্থি (Ear ossicles) : এগুলো মধ্যকর্ণের গহ্বরে অবস্থিত পরস্পর পেশি দিয়ে যুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো ৩টি ছোট অস্থি। অস্থি তিনটি হচ্ছে :

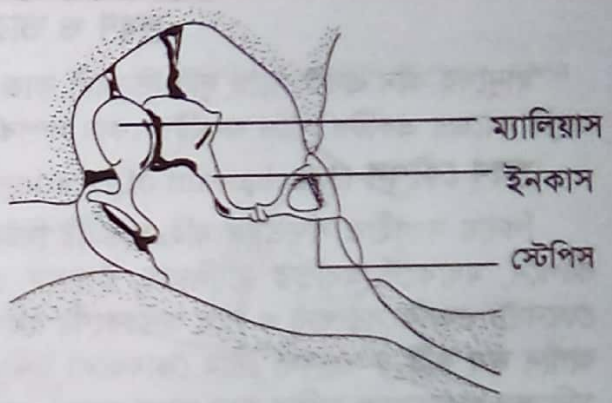

চিত্র ৮.১৯ : মধ্যকর্ণের অস্থিসমূহ

i. **ম্যালিয়াস** (Malleus) : হাতুড়ির মতো দেখতে এ অস্থি একদিকে টিমপেনিক পর্দার সাথে অন্যদিকে পরবর্তী অস্থি ইনকাস-এর সাথে যুক্ত।

ii. **ইনকাস** (Incus) : এ অস্থিটি দেখতে নেহাই (anvil)-এর মতো এবং ম্যালিয়াস ও স্টেপিসকে যুক্ত করে।

iii. **স্টেপিস** (Stapes) : এ অস্থিটি দেখতে ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো (ত্রিকোণাকার)। অস্থিটি একদিকে ইনকাসের সাথে অন্যদিকে, ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে।

কাজ : অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিমপেনিক পর্দা থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণের অভ্যন্তরে পেরিলিম্ফে বহন করে।

৩. ছিদ্রপথ : মধ্যকর্ণের প্রাচীর পেরিওটিক অস্থিতে গঠিত, তবে সেখানে দুটি ছোট ছিদ্রপথ থাকে। উপরের দিকে ডিম্বাকার ছিদ্রকে **ফেনেস্ট্রা ওভালিস** (fenestra ovalis) এবং নিচের দিকের গোল ছিদ্রকে **ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা** (fenestra rotunda) বলে। ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মাধ্যমে শব্দ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। শব্দতরঙ্গ ককলিয়ায় প্রবেশের পর অবশেষে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার মাধ্যমে বাইরে চলে আসে।

গ. অন্তঃকর্ণ (Internal ear)

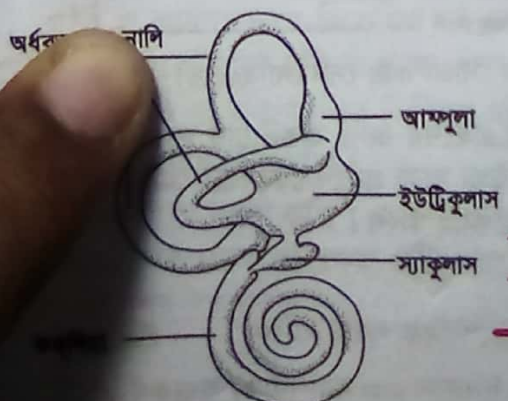

চিত্র ৮.২০ : অন্তঃকর্ণ

প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ করোটির শ্রুতিকোটরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণের গঠনকে **মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ** (membranous labyrinth) বলে। এটি **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labyrinth)-এ পরিবেষ্টিত। মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ **এন্ডোলিম্ফ** (endolymph) নামক তরলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ **পেরিলিম্ফ** (perilymph)-এ পূর্ণ। প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত– **ইউট্রিকুলাস** (utriculus) এবং **স্যাকুলাস** (succulus)।

১. ইউট্রিকুলাস (ভারসাম্য অঙ্গ) : এটি অন্তঃকর্ণের উপরদিকের গোলাকার প্রকোষ্ঠ। ইউট্রিকুলাসের সাথে দুটি উল্লম্ব ও একটি অনুভূমিকভাবে অবস্থিত মোট ৩টি **অর্ধবৃত্তাকার নালি** (semicircular canal) থাকে। নালিগুলো পরস্পর সমকোণে অবস্থিত। প্রত্যেক নালির এক

প্রান্ত স্ফীত হয়ে **অ্যাম্পুলা** (ampulla) গঠন করে যার মধ্যে সংবেদী কোষ ও রোম থাকে। রোমগুলো চুনময় **ওটোলিথ** (otolith) দানা সম্বলিত জেলির মতো **ক্যুপুলা** (cupula)-য় আবৃত। ইউট্রিকুলাস দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্ককে সাহায্য করে এবং দেহ-অবস্থানের অনুভূতির উদ্রেক করে।

২. স্যাকুলাস (শ্রবণ অঙ্গ) : এটি অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ যা অঙ্কীয়দেশ থেকে প্রলম্বিত এবং শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো একটি নালিকার সৃষ্টি করেছে। এর নাম **ককলিয়া** (cochlea)। এটি তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট: উপরে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা ভেস্টিবুলি** (scala vestibuli), মাঝে এন্ডোলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা মিডিয়া** (scala media) এবং নিচে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা টিমপেনি** (scala tympani)। স্ক্যালা মিডিয়া উপরে **রেসনার-এর ঝিল্লি** (reissner's membrane) ও নিচে **বেসিলার ঝিল্লি** (basilar membrane)তে আবদ্ধ। বেসিলার ঝিল্লির উপরের কিছু এপিথেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে সংবেদী **অর্গ্যান অব কর্টি** (organ of corti) গঠন করেছে। এগুলোর সংবেদী রোমও ক্যুপুলায় আবৃত। একেবারে শীর্ষে ককলিয়ার উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। এর নাম **হেলিকোট্রিমা** (helicotrema)। শ্রবণ অনুভূতি জাগানো স্যাকুলাসের কাজ।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা

মানুষের কান একই সাথে দুটি ভিন্নধর্মী কাজ সম্পাদন করে থাকে। এদের একটি **শ্রবণ** ও অন্যটি **ভারসাম্য রক্ষা**। এদুটি কাজের একটির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রবণ কৌশল (Mechanism of Hearing)

পিনায় সংগৃহীত শব্দতরঙ্গ বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রবেশ করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। কাঁপনে, মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থিতিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কাঁপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে কাঁপন হলে ককলিয়ার **অর্গান অব কর্টি**-র সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়।

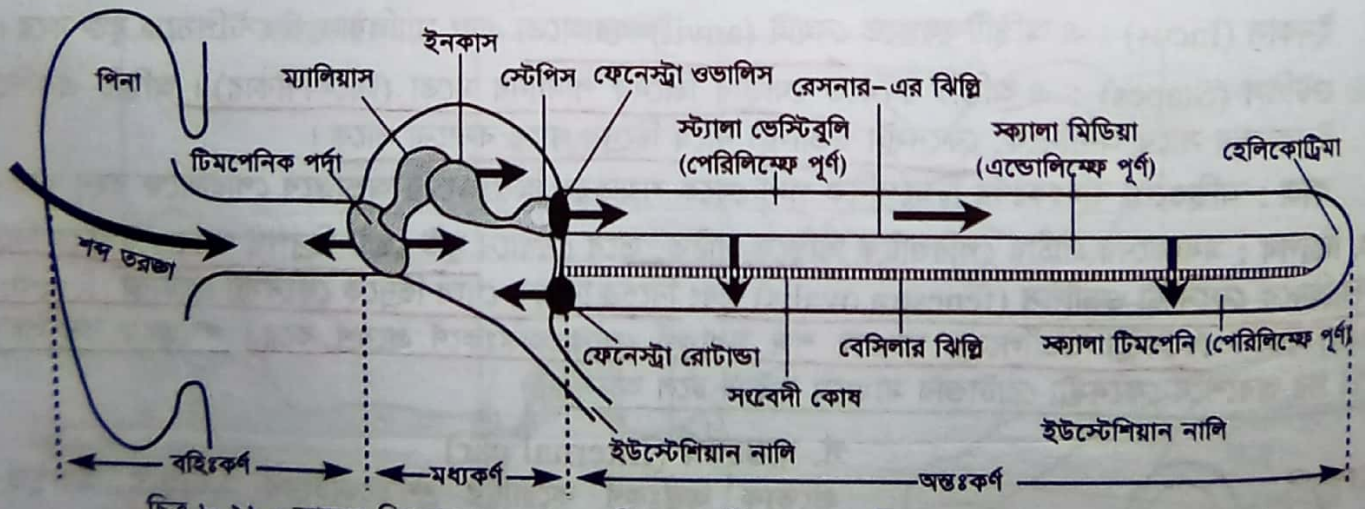

চিত্র ৮.২১ : কানের ভিতর শব্দতরঙ্গের গতিপথের চিত্ররূপ (ককলিয়া সোজা করে দেখানো হয়েছে)

মাত্রা অনুযায়ী শব্দ উচ্চ, মধ্যম ও নিম্নমাত্রার হয়ে থাকে। এসব মাত্রা গ্রহণের জন্য ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায় (বেসিলার ও রেসনার-এর ঝিল্লিতে) বিশেষ স্থান রয়েছে। স্থানগুলো হচ্ছে ঃ উচ্চ মাত্রা গ্রহণে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ; মধ্যম মাত্রা গ্রহণে মাঝামাঝি অংশ; এবং নিম্ন মাত্রা গ্রহণে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ।

শ্রবণ প্রক্রিয়ার গতিপথ–

শব্দ তরঙ্গ ⇒ পিনায় বাধা ⇒ কর্ণকুহরে প্রবেশ ⇒ টিম্পেনিক পর্দায় কাঁপন

পেরিলিম্ফ ⇐ ককলিয়া ⇐ ফেনেস্ট্রা ওভালিস ⇐ (স্টেপিস ⇐ ইনকাস ⇐ ম্যালিয়াস) মধ্যকর্ণ

এন্ডোলিম্ফ ⇒ অর্গান অব কর্টি ⇒ সংবেদী কোষে উত্তেজনা ⇒ স্নায়ু স্পন্দন মস্তিষ্কে প্রেরণ ⇒ শ্রবণ

ভারসাম্য রক্ষা কৌশল (Mechanism of maintaining Balance)

অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার নালির মূলে অবস্থিত **অ্যাম্পুলা** এন্ডোলিম্ফে পরিপূর্ণ ও সংবেদী রোমকোষ সম্পন্ন। এ রোমগুলোর সাথে **ক্যুপুলা** নামক জেলীর মতো বস্তু সংযুক্ত থাকে। মানুষ মাথা ঘোরালে বা কোনো দিকে দেহ বাঁকালে, সেদিকে অ্যাম্পুলার এন্ডোলিম্ফ প্রবাহিত হয়ে ক্যুপুলার অবস্থান পরিবর্তিত হয়। এ অনুভূতি সংবেদী কোষগুলো গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পাঠায়। এন্ডোলিম্ফে পূর্ণ ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসে **স্যাকুলা** নামক এক অঙ্গ থাকে যা $CaCO_3$-সমৃদ্ধ অটোলিথিক মেমব্রেনে আবদ্ধ সংবেদী রোমকোষ বহন করে। মানুষের মাথা কোনো এক দিকে হেলে গেলে অটোলিথিক মেমব্রেন রোমকোষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে রোমকোষ উদ্দীপিত হয় এবং স্নায়ুর মাধ্যমে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায় ও মাথাকে সঠিক অবস্থানে রাখতে সাহায্য করে। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (gravity) অনুভূতি শনাক্ত করে। অন্যদিকে অ্যাম্পুলা ঘূর্ণনের অনুভূতি সংগ্রাহক (rotatory receptor) হিসেবে কাজ করে। এ দুই অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে অনবরত মস্তিষ্কে পৌছায়। অতঃপর মস্তিষ্ক তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে মানুষ নিজেকে সোজা রাখতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

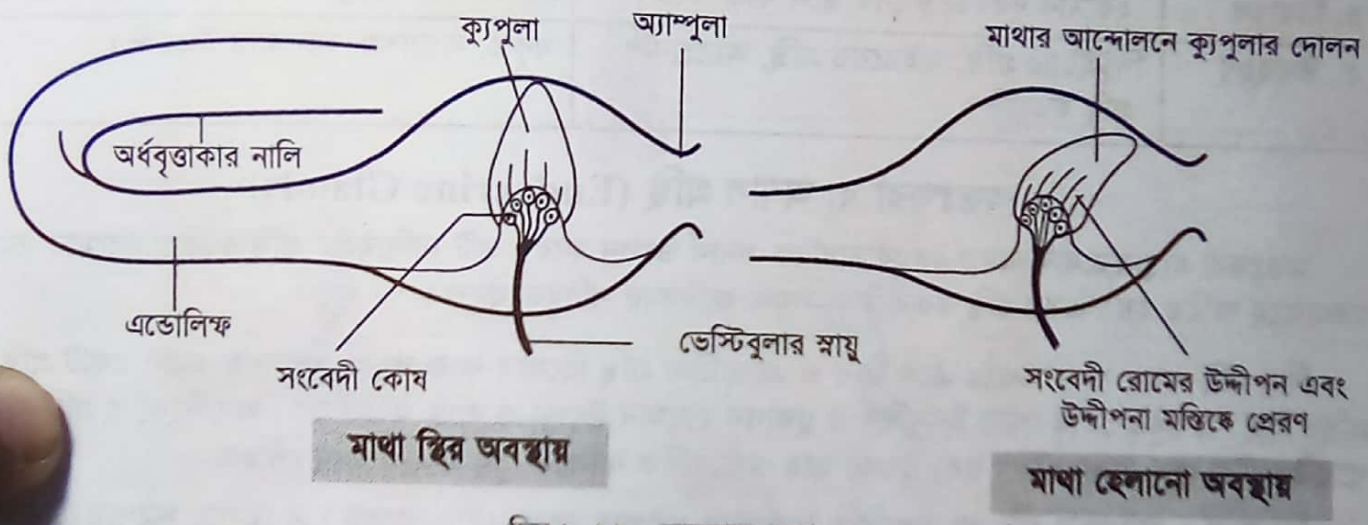

চিত্র ৮.২২ : ভারসাম্য রক্ষা

রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical coordination)

মানবদেহে যাবতীয় কাজে রাসায়নিক সমন্বয়কারী হিসেবে **হরমোন** নামক এক জৈবরাসায়নিক পদার্থ ভূমিকা পালন করে। হরমোন উৎপন্ন হয় প্রধানত এক বিশেষ গ্রন্থিতন্ত্র থেকে। ক্ষরণ গুণসম্পন্ন একটি মাত্র কোষ বা কোষগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় **গ্রন্থি** (gland)। মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা ধরনের অসংখ্য গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনা করে।

গঠন ও কার্যগতভাবে বিশেষিত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ দেহের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, তাকে **গ্রন্থি** বা **গ্ল্যান্ড** বলে। গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু। ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থি দুধরনের-১. **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (Exocrine Glands) এবং ২. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endocrine Glands)।

বহিঃক্ষরা বা সনাল গ্রন্থি : যে সব গ্রন্থি নিজের ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থ নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরেই বহন করে, সেগুলোকে **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে **রস** বা **জুস** (juice) বলে। যেমন-লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি গ্রন্থি।

অন্তঃক্ষরা বা অনাল গ্রন্থি : যে সব গ্রন্থি নালিবিহীন, তাই ক্ষরণ সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, সে সব গ্রন্থিকে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বা **অনাল গ্রন্থি** (ductless gland) বলে। উদাহরণ- পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল ইত্যাদি গ্রন্থি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে **হরমোন** বলে।

অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
১. সংজ্ঞা	মানবদেহে নালিবিহীন গ্রন্থিসমূকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।	মানবদেহে নালিযুক্ত গ্রন্থিসমূহকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
২. নিঃসরণ	এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থের নাম হরমোন।	এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থের নাম রস, জুস, এনজাইম।
৩. পরিবহন	রক্তে পরিবাহিত হয়।	নালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৪. ক্রিয়াস্থল	হরমোন দূরবর্তী টার্গেট স্থলে কাজ করে।	এটি নিকটবর্তী বা দূরবর্তী উভয় টার্গেট স্থলে কাজ করে।
৫. উদাহরণ	পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।	যকৃত, অগ্ন্যাশয়, লালাগ্রন্থি ইত্যাদি।

অন্তঃক্ষরা বা অনাল গ্রন্থি (Endocrine Glands)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি **হরমোন** নামক জৈবরাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এটি নালিবিহীন গ্রন্থি হওয়ায় হরমোন সরাসরি রক্তপ্রবাহে ক্ষরিত হয়। এসব গ্রন্থি রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ জালিকায় পরিবৃত থাকে।

কিছু গ্রন্থি আছে যা একাধারে এন্ডোক্রিন ও এক্সোক্রিন গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। অগ্ন্যাশয় এমনি একটি গ্রন্থি। এ গ্রন্থির কিছু বিশেষিত কোষ থেকে **ইনসুলিন** ও **গ্লুকাগন** হরমোন উৎপন্ন ও রক্তে ক্ষরিত হয়। অন্যদিকে, এ গ্রন্থি থেকেই **প্যাংক্রিয়াটিক জুস** (অগ্ন্যাশয়িক রস) উৎপন্ন হয়ে অগ্ন্যাশয়িক নালিতে বাহিত হয়ে অন্ত্রে পৌছায়।

নামকরণ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সূত্রপাত বেশ আগে থেকেই। এ বিদ্যার সূত্রপাত চীনদেশে। সেখানে খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে অভিনব উপায়ে মানুষের মূত্র থেকে যৌন ও পিটুইটারি হরমোন সংগ্রহ করে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতো। তবে সুনির্দিষ্টভাবে হরমোন (সিক্রেটিন) শনাক্ত করেন ১৯০২ সালে দুই ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ William Bayliss এবং Ernest Starling। তাঁরা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে এ রাসায়নিককে **হরমোন** নামে অভিহিত করেন। গ্রিক শব্দ *hormao* (to excite = উদ্দীপ্ত/ উত্তেজিত করা) থেকে হরমোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hormone)

হরমোন দেহের **রাসায়নিক দূত** (chemical messenger) হিসেবে সুপরিচিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

i. হরমোন এক ধরনের ক্ষুদ্র ও জৈব অণু।
ii. হরমোন রক্তে বাহিত হয়।
iii. উৎপত্তিস্থল থেকে (নির্দিষ্ট কোষ বা কোষগুচ্ছ বা গ্রন্থি থেকে) সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের দূরবর্তীস্থানে পরিবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট অংশে (target) কাজ করে।
iv. হরমোন এক ধরনের দ্রবণীয় জৈব অনুঘটকের কাজ করে কিন্তু কাজ শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
v. হরমোন স্বল্প মাত্রায় বা ঘনত্বে কার্যকর হয় এবং ক্রিয়ার স্থায়িত্বকাল অনেকদিন বজায় থাকে।
vi. হরমোন সাধারণত ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে না।
vii. অধিকাংশ হরমোনের ক্রিয়া ধীরে সংঘটিত হয়।
viii. একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে একাধিক হরমোন ক্ষরিত হতে পারে কিন্তু এগুলোর কাজ বা ক্ষরণ পরস্পর নির্ভরশীল নয়।
ix. স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে হরমোন বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
x. হরমোন জীবদেহের কোষে কোষে রাসায়নিক সংযোগ সাধন করে এবং রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে।

ছক আকারে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও কাজ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি		নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
১. পিটুইটারি [অবস্থান-মস্তিষ্ক]	A. অগ্রভাগ	i. বৃদ্ধিপোষক হরমোন (STH) ii. থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH) iii. লুটিনাইজিং হরমোন (LH) iv. ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (FSP) v. প্রোল্যাকটিন হরমোন (PRL) vi. অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (ACTH)	i. অস্থি ও কোমল টিস্যুর বৃদ্ধি; প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ। ii. থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ। iii. নারীদেহে ডিম্বপাত ও দুগ্ধ ক্ষরণ এবং পুরুষে টেস্টোস্টেরণ ক্ষরণ উদ্দীপ্ত করা। iv. ডিম্বাশয়ে ফলিকলের পূর্ণতা দান। v. স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। vi. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
	B. মধ্যভাগ	i. মেলানোসাইট উদ্দীপক হরমোন (MSH)	মেলানোফোর কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
	C. পশ্চাদ্‌ভাগ	i. অ্যান্টিডাই-ইউরেটিক হরমোন (ADH) ii. অক্সিটোসিন	i. বৃক্কীয় নালির পানি শোষণ ক্ষমতা এবং রক্তবাহিকার প্রাচীর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ। ii. জরায়ু-সংকোচন ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
২. থাইরয়েড [অবস্থান-শ্বাসনালি]		i. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3) ii. থাইরক্সিন (T_4) iii. ক্যালসিটোনিন (CT)	i. বিপাক হার, হৃৎস্পন্দন ও প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ। i. বিপাকীয় প্রক্রিয়া ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। ii. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
৩. প্যারাথাইরয়েড [অবস্থান-থাইরয়েডের পৃষ্ঠদেশে]		i. প্যারাথরমোন (PTH)	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
৪. থাইমাস [অবস্থান-শ্বাসনালির নিচে]		i. থাইমোসিন	লিম্ফোসাইট প্রস্তুতি ও অ্যান্টিবডি গঠন।
৫. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস [অবস্থান-অগ্ন্যাশয়]		i. ইনসুলিন ii. গ্লুকাগন	i. রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা কমানো; গ্লাইকোজেন সংশ্লেষ বা গ্লাইকোজেনেসিসে সহায়তা। ii. রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে তা বাড়ানো, গ্লাইকোজেনোলাইসিসে সহায়তা।
৬. অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল [অবস্থান- প্রতিটি বৃক্কের উর্ধ্ব প্রান্তে]	A. কর্টেক্স	i. গ্লুকোকর্টিকয়েড ii. মিনারেলোকর্টিকয়েড	i. শর্করা ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ। ii. খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
	B. মেডুলা	i. অ্যাড্রেনালিন ii. নর-অ্যাড্রেনালিন	i. গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্ত করে বিপাকীয় হার নিয়ন্ত্রণ, হৃৎগতি বৃদ্ধি ও দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ। ii. হৃৎপেশি উদ্দীপ্ত হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।
৭. পিনিয়াল [অবস্থান- মস্তিষ্কের ৩য় প্রকোষ্ঠে]		i. মেলাটোনিন	i. ফসফরাস বিপাক দ্রুত করা। ii. যৌন অঙ্গের সক্রিয়তা ঘটানো।
৮. শুক্রাশয় [অবস্থান-পূর্ণাঙ্গ পুরুষদেহের স্ক্রোটাম নামক থলির মধ্যে]		i. অ্যান্ড্রোজেন	পুরুষদেহের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো, গৌণ যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা এবং শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখা।
৯. ডিম্বাশয় [অবস্থান-স্ত্রীদেহের শ্রোণীগহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দুপাশে]		i. এস্ট্রোজেন ii. প্রোজেস্টেরণ	i. বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীদেহের বিভিন্ন যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা এবং রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ। ii. স্ত্রীদেহে গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

অন্তঃক্ষরা বা এন্ডোক্রিন গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া
(Location, Secretion and Function of Endocrine Glands)

হরমোন শুধু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষ থেকে নয় বরং দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত কতকগুলো বিশেষায়িত কোষ থেকেও নিঃসৃত হয়। নিম্নে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

১। পিটুইটারি গ্রন্থি,
২। থাইরয়েড গ্রন্থি,
৩। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি,
৪। অ্যাড্রেনাল ও সুপ্রারেনাল গ্রন্থি,
৫। থাইমাস গ্রন্থি,
৬। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স,
৭। পিনিয়াল গ্রন্থি,
৮। গোনাড,
৯। অমরা এবং
১০। বিভিন্ন টিস্যুস্থিত বিশেষায়িত কোষ।

নিচে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

পিটুইটারি গ্রন্থিকে হরমোন সৃষ্টিকারী **প্রধান গ্রন্থি** বা **প্রভু গ্রন্থি** (Principal / Master gland) বলে। কারণ একদিকে, পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি, অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কিন্তু সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি।

অবস্থান ও আকৃতি : এ গ্রন্থি চোখের পেছনে মস্তিষ্কের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র বৃন্তের সাহায্যে যুক্ত থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থি একটি ক্ষুদ্র প্রায় ১ সে.মি. ব্যাস সম্পন্ন লালচে ধূসর, দেখতে মটর দানার মতো, ০.৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট গ্রন্থি।

পিটুইটারি গ্রন্থি ৩টি খন্ডে বিভক্ত, যথা– **ক. সম্মুখ পিটুইটারি, খ. মধ্য পিটুইটারি, গ. পশ্চাৎ পিটুইটারি।**

ক. সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে ৬টি **ট্রপিক হরমোন** (tropic hormone) ক্ষরিত হয়। যে হরমোন অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে তার হরমোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলো হচ্ছে ট্রপিক হরমোন। এমন ৬টি ট্রপিক হরমোন সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থিতে উৎপন্ন ও জমা হয় এবং প্রয়োজনে রক্তবাহিকায় ক্ষরিত হয়ে সারা দেহে প্রভাব বিস্তার করে।

১. **বৃদ্ধিপোষক হরমোন** (Somatotropic Hormone, STH): অস্থি ও কোমল টিস্যুর বৃদ্ধি, প্রোটিন সংশ্লেষ গ্লাইকোজেনের সঞ্চালন ও চর্বি সঞ্চয়কে উদ্দীপ্ত করে।

২. **থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন** (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH): থাইরয়েড গ্রন্থিকে থাইরয়ে হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

৩. **ল্যুটিনাইজিং হরমোন** (Luteinizing Hormone, LH): নারীদেহে ডিম্বপাত, কর্পাস ল্যুটিয়াম সৃ এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ সংশ্লেষকে উদ্দীপ্ত করে। পুরুষে টেস্টোস্টেরণ ক্ষরণেও LH উদ্দীপ্ত করে।

৪. **ফলিকল উদ্দীপক হরমোন** (Follicle-Stimulating Hormone, FSP):এর প্রধান কাজ হচ্ছে নারীদে ডিম্বাশয়ে ফলিকলের পূর্ণতা বা পরিপক্কতা দান করা এবং এস্ট্রোজেন সংশ্লেষে উদ্দীপনা জোগানো।

৫. **প্রোল্যাকটিন** (Prolactin, PRL) : সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এ হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির বৃ দুগ্ধ উৎপাদন, অনাক্রম্যের প্রতি সাড়াদান, সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ও পরিস্ফুটনের সময় নতুন রক্তকণি সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

৬. **অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন** (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH): অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স গ্লুকোকর্টিকয়েড নামক স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

খ. মধ্যপিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte Stimulati Hormone – MSH) নিঃসৃত হয়। এই হরমোন মেলানোফোর কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে

গ. পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি : এই গ্রন্থি থেকে দুটি হরমোন নিঃসৃত হয়।

i. **অক্সিটোসিন** (Oxytocin) **হরমোন :** স্তনের পেশি সংকোচন ঘটিয়ে দুগ্ধ ক্ষরণে সাহায্য করে ও প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচন ত্বরান্বিত করে।

ii. **ভেসোপ্রেসিন** (Vessopressin) বা **অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন** (Anti Diuretic Hormone– ADH রক্তচাপ বৃদ্ধি করে ও বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

অবস্থান : ট্রাকিয়ার (শ্বাসনালি) উভয় পাশে অবস্থিত। প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থি।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিচে বর্ণিত ৩টি সক্রিয় হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (Triiodothyronin, T3) : মৌলিক বিপাক হারকে উদ্দীপ্ত করে; হৃৎস্পন্দন হার, প্রোটিন সংশ্লেষ ও প্রোটিন বিনাশ, গ্লুকোজ সংশ্লেষ, লাইপোলাইসিস প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করে। এ হরমোন ভ্রূণ ও শিশুর পরিস্ফুটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. থাইরক্সিন (Thyroxine, T4) : বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন প্রোটিন সংশ্লেষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে দৈহিক বৃদ্ধি নির্ধারণ করে।

৩. ক্যালসিটোনিন (Calcitonine, CT) : এর প্রভাবে অন্ত্র ক্যালসিয়াম শোষণ করে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমায়; বৃক্ককে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দিয়ে মূত্রের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম মোচন করিয়ে রক্তে এর সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে; হাড়ে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ে; এবং ভিটামিন D নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে।

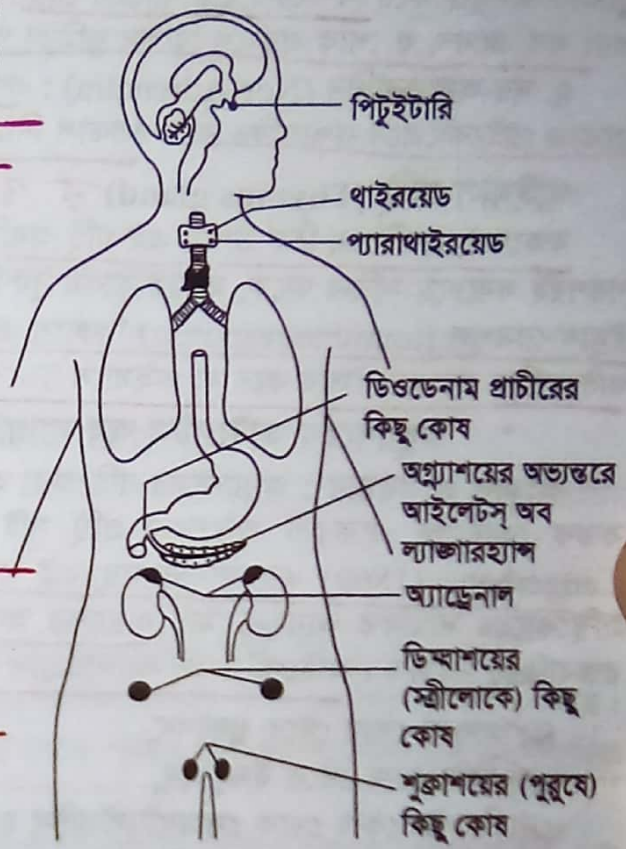

চিত্র ৮.২৩: মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)

অবস্থান : দুজোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থির পেছনে এবং আংশিকভাবে থাইরয়েডের মধ্যে অবস্থিত।

নিঃসরণ : প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনটি প্যারাথাইরয়েড হরমোন (Parathyroid Hormone, PTH) বা প্যারাথরমোন (Parathormone) বা প্যারাথাইরিন (Parathyrin) নামে পরিচিত।

ক্রিয়া : প্যারাথরমোন রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বৃক্কে ক্যালসিয়ামের পুনঃশোষণ বাড়িয়ে দেয়। রক্ত, হাড়, পেশি ও স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহে ক্যালসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া পেশির সংকোচন ও রক্ত জমাট বাঁধায়ও ক্যালসিয়ামের সঠিক মাত্রা প্রয়োজন। রক্তে ফসফেটের মাত্রা কমিয়ে দিতে এবং ভিটামিন D-কে সক্রিয়করণে ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন D-র অভাবে মানুষে **রিকেটস** রোগ দেখা দেয়।

অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal or Supra-renal gland)

অবস্থান ও আকৃতি : প্রতিটি বৃক্কের মাথায় টুপির মতো একটি করে মোট দুটি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থাকে। প্রত্যেক গ্রন্থির বাইরের হলুদ অংশকে **কর্টেক্স** (cortex) এবং ভিতরের পিঙ্গল বর্ণের অংশকে **মেডুলা** (medulla) বলে। এদের ওজন ৩-৫ গ্রাম।

নিঃসরণ : অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির উভয় অংশ থেকেই হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এদের কাজও ভিন্ন।

ক. কর্টেক্স নিঃসৃত হরমোন

অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে তিনধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়, ১. **গ্লুকোকর্টিকয়েড**, ২. **মিনারেলোকর্টিকয়েড** ও ৩. **যৌন কর্টিকয়েড হরমোন**।

১. **গ্লুকোকর্টিকয়েড** (Glucocorticoids) : শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

২. **মিনারেলোকর্টিকয়েড** (Mineralocorticoids) : খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **যৌন কর্টিকয়েড হরমোন** (Sex corticoid hormone) : অ্যান্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ নামক যৌন হরমোনগুলো যৌনাঙ্গের বর্ধন ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে।

খ. মেডুলা নিঃসৃত হরমোন

অ্যাড্রেনাল মেডুলা থেকে ২টি হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. অ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) : এর অপর নাম **এপিনেফ্রিন** (Epinephrine)। যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত করে বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনির অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২. নর-অ্যাড্রেনালিন (Nor-Adrenalin) : এর অপর নাম **নরএপিনেফ্রিন** (Norepinephrine)। দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland) র হরমোন আজীবন নয়।

বক্ষদেশ, হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে এই গ্রন্থি অবস্থিত। ভ্রূণ অবস্থায় এর কাজ শুরু হয় এবং জন্মের সময় এবং জন্মের পরপরই সবচেয়ে সক্রিয় থাকে, মায়ের বুকের দুধ ভিন্ন অন্য খাবারে অভ্যস্থ হবার পরপরই এটি হ্রাস পেতে শুরু করে। ইম্যুন রেসপন্স (immune response) বিকাশে এই গ্রন্থি গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থি বেশ কয়েকটি থাইমিন হরমোন (যথা- থাইমোসিন আলফা) তৈরি করে যা থাইমাসে T-কোষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

- **অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans in Pancreas)**

আকৃতি ও অবস্থান : অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশের মধ্যে কিছু কোষ একত্রিত হয়ে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত কতক কোষগুচ্ছ একেকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এগুলো **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স**। আবিষ্কারক Paul Langerhans (1869) এর নামানুসারে এই কোষগুচ্ছ "আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস" নামে পরিচিত। এসব গ্রন্থিকোষের সম্মিলিত আয়তন মোট অগ্ন্যাশয় আয়তনের ১-২%। প্রতিটি দ্বীপগ্রন্থির কোষ দানাদার, বহুভূজাকার ও রক্তবাহিকা সম্বলিত। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স চার ধরনের কোষে গঠিত।

(i) আলফা কোষ থেকে **গ্লুকাগন,**
(ii) বিটা কোষ থেকে **ইনসুলিন,**
(iii) ডেল্টা কোষ থেকে **সোমাটোস্ট্যাটিন** হরমোন নিঃসৃত হয় এবং
(iv) গামা কোষ (γ-cell) পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

১. **ইনসুলিন** রক্তে গ্লুকোজ বা শর্করার পরিমাণ হ্রাস করে। ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।

২. **গ্লুকাগন** দেহে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

৩. **সোমাটোস্ট্যাটিন** অন্যান্য হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** হরমোনের কাজ হলো খাদ্য গ্রহণের পর ক্ষরিত হয়ে ক্ষুধা হ্রাস করে।

গোনাড বা জননাঙ্গ (Gonad)

জননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গকে গোনাড বা জননাঙ্গ বলে। গোনাড দুধরনের- **শুক্রাশয়** এবং **ডিম্বাশয়**। এগুলো গ্রন্থিরূপী অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নয় কিন্তু এসব অঙ্গের অভ্যন্তরীণ কিছু টিস্যু অন্তঃক্ষরা টিস্যু হিসেবে কাজ করে। পুরুষ ও নারীদেহে যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় রয়েছে। এসব অঙ্গের অবস্থান, হরমোন ও ক্রিয়ার বর্ণনা নবম অধ্যায়ে দেয়া হলো।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব

মানবদেহের বৃদ্ধিতে দুটি হরমোন প্রধান ভূমিকা পালন করে। একটি হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত **গ্রোথ হরমোন** (Growth Hormone-GH) এবং অন্যটি থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **থাইরক্সিন হরমোন** (Thyroxine Hormone-TH)।

গ্রোথ হরমোনের ভূমিকা

১. তরুণাস্থি ও অস্থির কোষগুলোর পূর্ণতা প্রাপ্তিসহ এগুলোর বৃদ্ধি, অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চয় ইত্যাদি কাজে ভূমিকা রাখে।

২. কোষের অ্যামিনো এসিড গ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে দেহের পেশির বৃদ্ধি ঘটে।

৩. ক্ষুধার্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ ও মুক্ত ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেহের ক্ষয়-রোধ করে।

৪. অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন শোষণ ও বৃক্ক থেকে বিভিন্ন আয়ন পুনঃশোষণ করে দেহের বিভিন্ন আয়নের পরিমাণ বর্ধন ও দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. দেহের সকল নরম অঙ্গের (মস্তিষ্ক ছাড়া) আকার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।
৬. বেশি দুধ উৎপাদনে স্তনগ্রন্থিকে প্রভাবিত করে যা শিশুর দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে।
৭. এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

থাইরক্সিন হরমোনের ভূমিকা

১. পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।
২. প্রোটিন সংশ্লেষের হার বাড়িয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।
৩. কঙ্কাল পেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. বিভিন্ন টিস্যুর বিভেদ ও পরিপক্কতার জন্য এটি অত্যাবশ্যক।
৫. খাদ্যের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করে।

শারীরবৃত্তীয় কাজে হরমোনের প্রভাব

১. পৌষ্টিকনালির অন্তঃক্ষরা কোষ থেকে নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন ও কোলেসিস্টোকিনিন হরমোন পরিপাক ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজাইমগুলোর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

২. থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা বিপাক করে।

৩. থাইরক্সিন হরমোন প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও খনিজ আয়ন বিপাক এবং টেস্টোস্টেরণ ও ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, অ্যাড্রেনালিন হরমোন হৃৎক্রিয়া ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৫. অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরণ Na^+, K^+ আয়নের সমতা রক্ষা করে।

৬. স্টেরয়েডধর্মী হরমোনগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণে, গ্রোথ হরমোন ফ্যাটকে ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদনে প্রভাবিত করে।

৭. ADH হরমোন পানি শোষণ ও পানি সাম্য বজায় রাখে। বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন হরমোন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রোজেস্টেরণ জরায়ুর প্রাচীরে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপন এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়, টেস্টোস্টেরণ **শুক্রাণুজনন** (spermatogenesis)-এ শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

৯. প্রসবের সময় রিলাক্সিন শ্রোণীদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে এবং অক্সিটোসিন জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটিয়ে প্রসব ত্বরান্বিত করে।

১০. টেস্টোস্টেরণ, এস্ট্রোজেন ও গোনাডোকর্টিকয়েড হরমোন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১১. গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, এস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন সন্তান প্রসবকারী মায়ের স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব

আমাদের দেহের যে কোনো আচরণের রহস্য উদঘাটনে অবাক হতে হয় কতো নিখুঁত, সঠিক ও পরিমিত হরমোনের নিয়ন্ত্রণে দেহ পরিচালিত হচ্ছে। এর জন্যে রয়েছে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। জীবনের প্রত্যেক ধাপে বিভিন্ন ধাপে নারী, পুরুষ ও শিশুদেহের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব রয়েছে।

নারীদের আচরণগত পরিবর্তন

১. রজঃচক্র চলাকালীন সময় নারীর দেহের কিছু হরমোন ক্ষরণে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে নারীদের মধ্যে পুরুষের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার প্রবণতা বেড়ে যায়, খাদ্য গ্রহণ কমে যায় ইত্যাদি। সাধারণত নারীর দেহে ডিম্বপাতের সময় এগিয়ে আসলে এ ধরনের আচরণ করে থাকে।
২. রজঃচক্র বন্ধকালীন সময় এগিয়ে আসলে ডিম্বাশয়ে প্রোজেস্টেরণ, এস্ট্রোজেন ও অ্যান্ড্রোজেন হরমোন কম মাত্রায় ক্ষরিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নারীরা অল্প কিছুতে রেগে যায়, ঘুম ঠিকমতো হয় না, অনেকে আবার বিষণ্নতায় ভুগে থাকে।
৩. গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন-HCG (Human Chorionic Gonadotropin), প্রোজেস্টেরণ, রিলাক্সিন ইত্যাদি হরমোন ক্ষরণে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেখা যায় অনেকে অল্পতে রেগে উঠে, হঠাৎ কেঁদে ফেলে ইত্যাদি নানান পরিবর্তন দেখা যায়।

৪. অনেক সময় দেখা যায় সন্তান প্রসবের পর হরমোন ক্ষরণের তারতম্যের জন্য নারীরা নানান মানসিক রোগে ভুগেন। একে প্রসবোত্তর সাইকোসিস বলে।

পুরুষদের আচরণগত পরিবর্তন

১. টেস্টোস্টেরণের পরিমাণ বেড়ে গেলে যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।
২. অতিরিক্ত টেস্টোস্টেরণ হরমোন ক্ষরণের স্বভাবে হিংস্রতা সৃষ্টি হয় এবং শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।
৩. টেস্টোস্টেরণের পরিমাণ কমে গেলে বিষন্নতায় ডুবে যায়।
৪. শুক্র নিবৃত্তি বা অ্যান্ড্রোপজের সময় কাছে চলে আসলে যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে যায়।

শিশুদের আচরণগত পরিবর্তন

শিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থায় উপনীত হয় তখন হরমোনের আচরণগত প্রভাব স্পষ্ট হয়। হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালীন নারী-পুরুষে বিভিন্ন পরিবর্তন নবম অধ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল (Result of uncontrolled use of Hormone)

দেহ সচল, কর্মক্ষম রাখতে অতি অল্প ও নির্দিষ্ট পরিমাণ হরমোন দেহে প্রয়োজন হয়। কারও দেহে পরিমিত হরমোন ক্ষরিত না হলে নানা জটিল অবস্থা দেখা দিয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। এমন অবস্থায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট হরমোন ব্যবহার করতে হয়। হরমোনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কষ্টদায়ক জীবনের অবসান ঘটালেও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারটি উল্টো ফল বয়ে আনে। নিচে কয়েকটি প্রধান হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

১. বৃদ্ধি হরমোন : দেহকে স্থিতিশীল ও বৃদ্ধিসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হরমোন ব্যবহারের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে প্রচুর ফ্যাট, ডায়াবেটিস, সন্ধিব্যথা, হৃৎপিন্ড বড় হয়ে যাওয়ায় হার্ট ফেইলিউর এবং হাত, পা, মাথার হাড় অস্বাভাবিক বড় হয়ে যাওয়া।

২. থাইরক্সিন : থাইরক্সিনের স্বল্পতা পূরণে যে সংশ্লেষিত হরমোন (Levothyroxine) ব্যবহার করা হয় তাতে কেবল থাইরয়েড হরমোন স্বল্পতাই পূরণ হয় না, সে সঙ্গে থাইরয়েড ক্যান্সার এবং গলগন্ড প্রতিরোধেও সহায়ক হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যবহার হলে যে সব জটিলতা দেখা দেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ছদ্ম-গলগন্ড হতে পারে; তা ছাড়া দ্রুত হৃৎস্পন্দন, উদরীয় ব্যথা, চিন্তাগ্রস্ততা, খিটখিটে মেজাজ, ওজন কমে যাওয়া, ক্ষুধাবৃদ্ধি প্রভৃতি। অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া এবং মুখমন্ডল ও জিহ্বা ফুলে যায়। হার্ট ফেইলিউর এবং রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস মাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে।

৩. এপিনেফ্রিন (অ্যাড্রেনালিন) : ফুসফুসের ভিতরে বাতাস চলাচলের নালি খুলতে, রক্তবাহিকা সংকীর্ণ করতে এবং বিভিন্ন মারাত্মক অ্যালার্জিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে সংশ্লেষিত এপিনেফ্রিন ব্যবহৃত হয়। অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ, সঙ্গে মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, দুঃশ্চিন্তা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বুকব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, হঠাৎ দুর্বলতা, কথাবলা বা হাঁটাচলায় ভারসাম্যহীনতা, ঘনঘন শ্বাস নেওয়া প্রভৃতি।

৪. টেস্টোস্টেরণ : এটি পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হরমোন। এর স্বাভাবিক ক্ষরণে পুরুষ যৌনাঙ্গ সুগঠিত রাখে, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে পৌরুষ প্রদর্শন করে। বড়ি বা ইনজেকশনের মাধ্যমে টেস্টোস্টেরণের অভাব পূরণে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু এর অতিব্যবহারে প্রথমে দুর্বলতা, নিদ্রালুভাব, গায়ে ব্যথা, চামড়ায় জ্বালাপোড়া ভাব, মনোযোগহীনতা, হাত-পায়ের আঙ্গুল ঠান্ডা হয়ে আসা প্রভৃতি দেখা দেয়। পরে শুক্রাশয়ে ব্যথা, দ্রুত বা মন্থর হৃৎস্পন্দন, রক্তময় মলত্যাগ, মূত্রথলিতে ব্যথা, পিঠের দুপাশে বা মাঝখান ধরে ব্যথা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৫. এস্ট্রোজেন : এস্ট্রোজেন নারীদেহের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পরিমিত এস্ট্রোজেন নারীদেহকে সুস্থ, সবল ও সুদর্শন রাখে। কোনো কারণে দেহে অপর্যাপ্ত হরমোন উৎপন্ন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এস্ট্রোজেনবাহী বড়ি বা ইঞ্জেকশন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এসব সামগ্রীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে নারী বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে, যেমন- স্তন দৃঢ় হয়ে যাওয়া, ঢুলুঢুলুভাব, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, মাথাব্যথা, মানসিক ভাবের পরিবর্তন, বমিভাব, ত্বকে ফুসকুড়ি, মূত্রের রং পরিবর্তন ইত্যাদি।

৬. ইনসুলিন : আজকাল অনেকেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিয়ে জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এর ব্যবহার কঠোর নিয়ন্ত্রণে না থাকলে নতুন নতুন জটিলতায় ভোগার সম্ভাবনা থাকে, যেমন অবসাদ, ঢুলুঢুলুভাব, মাথাব্যথা, ক্ষুধা, মনোযোগে ব্যর্থ হওয়া, বমিভাব, স্নায়ুদৌর্বল্য, ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, ঘুমে ব্যঘাত, খিচুনি, ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।